শেখা-শিখি

ভাষা ★ সাহিত্য ★ বিজ্ঞান

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

১৯ - ২০ অক্টোবর ২০২৪

পরিচালনায় : জিডি স্টাডি সার্কেল

ব্যবস্থাপনায় : বর্ধমান আল আমিন মিশন

উৎকর্ষ সহযোগিতায় : অনুসন্ধান সোসাইটি

বিশেষ সহযোগিতায় : পাঠভবন সোসাইটি

প্রকাশনা সহযোগিতায় : ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী

শুভেচ্ছা

নিজে ক্ষয়ে অপরকে আলোকিত করাতেই তার আনন্দ

"আমাদের ছোট নদী
চলে আঁকে বাঁকে"

কবিগুরুর এই দুই পংক্তি আজও শত কাজের মাঝে যখন মনে পড়ে গুনগুনিয়ে ওঠে মন, ফিরে যাই ছোটবেলার দিনগুলিতে।

আসলে শিক্ষকের কাজ এটাই। শিক্ষার্থীর মনের দরজায় কড়া নাড়া। শুধু ক্লাস নেওয়া শিক্ষকের কাজ নয়, কেবলমাত্র কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা দান করা বা তার হাতে-কলমে প্রদর্শন করাও নয়। এমনকি সঠিক উত্তর দেওয়া শিক্ষার্থীকে রপ্ত করানোও শিক্ষকের কাজ নয়। বরং, শিক্ষকের কাজ হল শিক্ষার্থীর কল্পনাকে জাগিয়ে তোলা, সৃষ্টি ও স্রষ্টাকে চেনানো, প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করা, শিক্ষার্থীর মেধা ও বুদ্ধিমত্তাকে যথাযথ বিকাশ ঘটানো এবং তার দক্ষতাকে চিনতে সাহায্য করা। যাতে সে বুঝে নিতে পারে তার জীবনপথ, ন্যায়-অন্যায়ের ফারাক-বোধ স্পষ্ট হয়, চিনে নিতে পারে আদর্শ। সত্য-সরল পথে চলতে সে নির্ভীক হয়। লোক দেখানোর সততা নয় বরং শত সহস্র বাধাতেও সে সত্যকে পরিহার করে না।

একজন শিক্ষক জ্বলন্ত মোমবাতির মতো, নিজে ক্ষয়ে অপরকে আলোকিত করাতেই তার প্রশান্তি, তার যথার্থ ব্যাপ্তি। প্রকৃত অর্থেই শিক্ষা হল হাতিয়ার, শিক্ষক তার নিয়ন্ত্রক। এই হাতিয়ার যত শানিত হবে, ততই ভীত-সন্ত্রস্ত থাকবে অনৈতিকতা, স্বার্থবাদীতা। তোমরা আমাকে শিক্ষিত মা দাও, জাতির ভবিষ্যৎ আমি বদলে দেব, বলেছিলেন জননায়ক নেপোলিয়ন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে বহু মুসলিম নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

যে জাতি যতখানি শিক্ষককে সম্মান জানাতে শিখেছে, তার ইতিহাস ততখানিই আলোকোজ্জ্বল, ততোই সমুন্নত।

আগামী ১৯-২০ অক্টোবর ২০২৪ শিক্ষকদের এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সুদূরপ্রসারী এই আয়োজন জাতি গঠনের সেই সুমহান ব্রতে আরো বড় একটা ধাপ বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। শিক্ষক, প্রশিক্ষক, প্রশাসক যাঁরাই এই মহান কর্মে সামিল হয়েছেন, সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

মোস্তাক হোসেন

সমাজসেবী, শিল্পপতি ও চেয়ারম্যান, জিডি চ্যারিটেবল সোসাইটি

টিচার্স ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম - ২০২৪ প্রকাশনা

শেখা-শিখি

সূচিপত্র

বিষয়	পাতা নং
অংশগ্রহণকারী মিশনের নাম	২
চেয়ারম্যানের ডেস্ক থেকে- শেখ নুরুল হক	৩
প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু কথা – সৈয়দ নাসিরুদ্দিন	৪
কঠিন পাঠ সহজ হয় শিক্ষকের গুণে – অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল	৫
নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে – ডা: গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়	৬
শিক্ষা : সার্বিক বিকাশ, দক্ষতা, সময়োপযোগী সামাজিক চাহিদা পূরণ - ডঃ দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	৭
ভাষা নিয়ে ভাসা-ভাসা কথা – দিব্যগোপাল ঘটক	৮
পড়া শেখা-লেখা শেখা-বলা শেখা – মেচবাহার সেখ	১২
ভাষা শেখা – অমিত দে	১৫
ভূগোল আমার পছন্দের, তোমারও – অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়	১৮
সেভেন-এর ছাত্রীদের সঙ্গে কিছুক্ষণ – অধ্যাপক দেবব্রত মজুমদার	২০
গণিত পাঠদানের গোড়ার কথা – ডঃ পার্থ কর্মকার	২৩
The Effective Ways of Teaching and Learning – Dr Partha Sarathi Das	২৫
বিজ্ঞান (রসায়ন) ভালো লাগবে কীভাবে – আনিসুর আলী জমাদার	২৭
প্রশ্ন যখন প্রশ্ন নিয়ে – সোমনাথ মুখোপাধ্যায়	২৯
অনুসন্ধান সোসাইটি : এগিয়ে চলা শিক্ষা-সংস্কৃতির গোড়ার খোঁজে	৩০
কবিতা : শিক্ষক - রাহুল সেনগুপ্ত	৩২

পরিচালনায় : **জিডি স্টাডি সার্কেল**

ব্যবস্থাপনায় : **বর্ধমান আল আমিন মিশন**

উৎকর্ষ সহযোগিতায় : **অনুসন্ধান সোসাইটি**

বিশেষ সহযোগিতায় : **পাঠভবন সোসাইটি**

প্রকাশনা সহযোগিতায় : **ধী-লার্ন অ্যাকাডেমী**

।। অনুসন্ধান সোসাইটির পক্ষে **পান্থ মল্লিক** কতৃক প্রকাশিত ও মুদ্রিত ।।

G. D. STUDY CIRCLE

20/1B, A K Md Siddique Lane, Kolkata - 700016

Madhyamik Teachers' Orientation Programme

Date: 19 & 20 October, 24

Venue: Bardhaman Al Ameen Mission

Participating Missions

SL No.	Science Subjects Teachers From
1.	RAHMAT-E-ALAM MISSION
2.	MAULANA AZAD ACADEMY
3.	BARDHAMAN AL AMEEN MISSION
4.	BES AN NOOR MODEL SCHOOL (Girls)
5.	SIDDIQUE-E- AKBAR MISSION
6.	ADARSHA SHISHU ACADEMY
7.	TAUHID MISSION
8.	MALANCHA MISSION
9.	BANDEL GIRLS MISSION
10.	MAMOON NATIONAL SCHOOL
11.	AL-ALAM MISSON
12.	AL-MUSTAFA GIRLS HIGH SCHOOL
13.	AL-AMEEN FOUNDATION
14.	AZAD MISSION
15.	N. R. NATIONAL ACADEMY

SL No.	Literature Subjects Teachers From
1.	BES AN NOOR MODEL SCHOOL (Boys)
2.	SHISHU SADAN HIGH SCHOOL
3.	SARBERIA AN NOOR MISSION
4.	DOMOHANA G.D. MISSION
5.	AL HADI MISSION
6.	AN NISA MISSION
7.	SEHARABAZAR RAHAMANIA AL-AMEN MISSION
8.	NAUMANIA MISSION
9.	AL-AMEEN MILLI MISSION
10.	KHADIJATUL KUBRA GIRLS MISSION
11.	AL-EKRA S.W.S. MISSION
12.	SILAMPUR ABASHIK MISSION
13.	BARJORA KISHALAY MISSION
14.	NABABIA MISSION
15.	AL-AKRAM MISSION

চেয়ারম্যানের ডেস্ক থেকে

শেখ নুরুল হক

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলতেন "আমি সবসময় অনুভব করেছি যে ছাত্রের জন্য প্রকৃত পাঠ্যপুস্তক হল তার শিক্ষক।" বিশেষ করে বয়সন্ধিকালে অর্থাৎ পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে। ফলে এই সময়ে বাবা মা ও শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন চরিত্র গঠন, পঠন-পাঠন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি। দশ থেকে ষোল বছর বয়সে আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জীবনের বিভিন্ন দিকে যথেষ্ট ভালো পরিবর্তন হতে পারে যদি শিক্ষকগণ উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন উন্নত মানের শিক্ষাদানের মাধ্যমে।দুই বছর কোভিড পরিস্থিতিতে ছাত্রদের মধ্যে বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণে অনীহা বেড়েছে। এই সময়ে শিক্ষা দানের পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং কিছু খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। ফলে ছাত্রদের মধ্যে এই প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে এই নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকর্ষণ যথেষ্ট বেড়েছে। ফলে, ক্লাশ রুমে গতানুগতিক শিক্ষাদান পদ্ধতিরও বেশ পরিবর্তন প্রয়োজন। অক্টোবর ১৯-২০, ২০২৪ তারিখের কর্মশালা থেকে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকগণ ধারণা করে নিতে পারবেন কিভাবে ক্লাশ রুমে শিক্ষাদান করবেন। কারণ, অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী শিক্ষকগণ এই কর্মশালা পরিচালনা করবেন।বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা গ্রহণ পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এবং কলেজে শিক্ষালাভে বড় ভূমিকা পালন করে। সেই জন্য আমাদের সকলের উচিৎ এই কর্মশালা থেকে যতটা সম্ভব জ্ঞান লাভ করি। উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে, ইংরাজী ও বাংলা ব্যাকরণ এবং অনুবাদ কেবলমাত্র মাধ্যমিক স্তরে পড়ানো হয় বিশেষ করে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। পরবর্তী সময়ে ব্যাকরণ এবং অনুবাদ পড়ানো হয় না, কিন্তু সাহিত্যচর্চা বেশি হয়, এইভাবে পাটিগণিত ও পরিমিতি মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত পড়ানো হয়, তার পরে বীজগণিত এবং অঙ্কের অন্যান্য শাখাগুলি আলোচিত হয়। কিন্তু ইংরাজী ব্যাকরণ, অনুবাদ, পাটিগণিত ও পরিমিতি প্রতিযোগিতামূলক সমস্ত পরীক্ষায়, এমনকি সিভিল সার্ভিসে বেশি প্রশ্ন থাকে।উপরন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক ধারণা (concept) দশম শ্রেণীর মধ্যে মজবুত হলেই উচ্চশিক্ষায় উপযুক্ত জ্ঞানলাভ করা যায়। যদি এই সময়ে বিষয়গুলিতে বোঝার ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকে, উচ্চশিক্ষায় জ্ঞানলাভও পরিপূর্ণ হয় না। যা বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সেই জন্য আবাসিক মিশনে শিক্ষাদান এমন পদ্ধতিতে হওয়া প্রয়োজন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিক জ্ঞানলাভ ও ধারণা (concept) পায়। তাই অংশগ্রহণকারী সমস্ত শিক্ষককে অনুরোধ করবো সবাই এই কর্মশালার সম্পূর্ণ ফল গ্রহণ করুন এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আরো আকর্ষণীয় করুন।

শেখ নুরুল হক
অবসরপ্রাপ্ত আই.এ.এস,
চেয়ারম্যান, জিডি মনিটরিং কমিটি

প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গে কিছু কথা

সৈয়দ নাসিরুদ্দিন

সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে মিশনের শিক্ষক শিক্ষিকারা যে নিষ্ঠার পরিচয় রেখে চলেছেন তা যথেষ্ট গর্ব করার মতো, এখন প্রয়োজন তাতে শান দেওয়া। সেই লক্ষ্যেই এই কর্মশালা।

সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা এক বিরল ব্যক্তিত্ব বেগম রোকেয়ার ভাবনায় ও কথায় - যে জাতির শিক্ষা নেই, সে জাতির ভবিষ্যৎ নেই। সারা জীবন তিনি শিক্ষার জন্য, বিশেষ করে নারী শিক্ষার জন্য লড়াই করেছেন সমাজের প্রতিকূলতার সঙ্গে।মুসলিম সমাজ সম্বন্ধে বলতে গেলে আমরা আধুনিক শিক্ষাহীনতায় ভ্রষ্ট। স্বাধীনতার আগে ও পরে আমাদের নীতিতে ভুল-ভ্রান্তি ছিলো। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। বাস্তব অবস্থাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সাচার কমিটির রিপোর্ট। কি শিক্ষায়, কি স্বাস্থ্যে, কি অর্থনৈতিক অবস্থায়, কি ব্যবসায়- সর্বত্র মুসলিম সমাজের অবস্থান একেবারে নীচে, এমনকি তপশিলী উপজাতিরও পিছনে। বিশ্লেষকদের মতে, এই অবস্থা থেকে উন্নত হওয়ার একমাত্র হাতিয়ার শিক্ষার বিস্তার। সেটা সম্ভব যদি আমাদের ঈমান বা বিশ্বাস ঠিক থাকে। ধর্মের নির্দেশ ছিল ইকরা। এমনকি জ্ঞানার্জনের জন্য দূর চিন দেশেও যাওয়ার কথা। আমরা তা অনুসরণ করতে ব্যর্থ বলেই পিছিয়ে থাকার' তকমাআমাদের। কিন্তু 'হা-হুতাশ' বেরিয়ে আসার পথ নয়। চেষ্টা করতে হবে উন্নতির।আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গে আবাসিক মিশন স্কুল সংস্কৃতির মাধ্যমে নিঃশব্দে মুসলিম সমাজে শিক্ষায় অগ্রগতির এক বিপ্লব যুগের সূচনা হয়েছে। একালের হাজী মহসিন জনাব মোস্তাক হোসেনের নেতৃত্বে, উপদেশে ও সাহায্যে এই আন্দোলন গোটা সমাজটাকে নাড়িয়ে দিয়েছে এবং ঘুম ভাঙাচ্ছে। এযাবৎ অনেক মিশন তৈরী হয়েছে ও হচ্ছে। ফলত; পরিসংখ্যানের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। জনাব মোস্তাক হোসেন প্রতিষ্ঠিত 'জি. ডি. স্টাডি সার্কেলের' সঙ্গে বর্তমানে ৫০ টি মিশন যুক্ত হয়েছে যার বাহাত্তরটি শাখা। পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র ও ছাত্রীদের সমান উৎসাহ দেওয়ার কাজ চলছে। মিশনগুলিতে শুধু ভর্তি ও গতানুগতিক পাঠদান নয়, উন্নত মানের শিক্ষা দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। ভালো শিক্ষার সঙ্গে ভালো মানুষ হওয়ার পাঠও আবশ্যিক।লক্ষ্য নির্ধারণ এক, তা পূরণ করা আর এক বিষয়। লক্ষ্য পূরণে মিশনগুলির শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ যে সেবা, সহিষ্ণুতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে নিজেদের নিয়োজিত রাখছেন তা আমাদের কাছে গর্বের ও আশার। এই প্রচেষ্টাকে আরো শানিত করতে নিয়মিত চর্চা ও যুগোপযোগী প্রযুক্তির মিশ্রন প্রয়োজন। নানা বিজ্ঞ জনের নানা পরামর্শের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য আমাদের এই শিক্ষক প্রশিক্ষন কর্মশালা। তবে এই প্রশিক্ষণে একেবারেই একতরফা বক্তব্য পেশ হবে না, বরং পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের সমৃদ্ধ করার চেষ্টা হবে। আমাদের বিশ্বাস, এতে আমরা সকলেই উপকৃত হবো।

সৈয়দ নাসির উদ্দিন
সাবেক বিশেষ সচিব,
সি.এম.ও, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কঠিন পাঠ সহজ হয় শিক্ষকের গুণে

অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল

দিন বদলাচ্ছে, ধাঁচ তো বদলাবেই। মনে রাখতে হবে শিক্ষকদের এ কথা।
পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা যত উৎসাহ নিয়ে ভরিয়ে তুলবে শিক্ষাঙ্গন, ততই শিক্ষকের জয়জয়কার।

শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষকের সব থেকে বড় পরিচয় হলো তাঁর আচার-আচরণ, ব্যবহার, এক কথায় বলা যায় শিক্ষক সুলভ ইমেজ। একজন শিক্ষার্থী সব সময় একজন শিক্ষককে দেখতে চায় আদর্শ হিসেবে। শিক্ষক সবকিছু জানেন, এমন ভাব তাঁর কখনোই করা উচিত নয়। বরং শিক্ষক যদি তাঁর ছাত্রদের বলেন, আজকের ক্লাস থেকে আমি তোদের কাছে অনেক কিছু শিখতে পারলাম, বেশ কয়েকটা নতুন পয়েন্ট জানলাম। তাহলে শিক্ষার্থী অনেক বেশি উৎসাহিত হবে, উদ্বুদ্ধ হবে। কোনো বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের কিউরিওসিটি জন্মিয়ে ক্রিয়েটিভ এবং ক্রিটিকাল থিংকিং-এ উন্নীত করাই শিক্ষকের কাজ।

আলবার্ট আইনস্টাইন বলেছিলেন, একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হল ছাত্রের মনে সৃজনশীল কাজ আর জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ আর আনন্দ জাগ্রত করা। মনে রাখতে হবে হাতের পাঁচ আঙ্গুল সমান হয় না, শিক্ষার্থীও তেমনই সকলে একই ধরনের হবে, এটা মনে করা ভুল। কেউ একটু ধীরে শেখে, আবার কেউ অতি দ্রুত, আবার কেউ বা মাঝারি, এটাই তো স্বাভাবিক।

ধীর গতির শিক্ষার্থীদের নিয়েই হয় সমস্যা। অনেক সময়েই শিক্ষকরা বলে ফেলেন, এই সহজ পড়াটা পারলি না, তোর দ্বারা কিছু হবে না। শিক্ষকের এরকম আচরণ কিন্তু ওদের আরো অনেকটা পিছিয়ে দেয়, আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, ওদের এই পিছিয়ে পড়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। যেগুলির দায় হয়তো বা ওই ব্যক্তি-ছাত্রের ওপর খুব একটা বর্তায় না। পারিবারিক দারিদ্র্য, দীর্ঘ অসুস্থতা, বিভিন্ন কারণে স্কুলে অনুপস্থিতি ইত্যাদি কারণে তার এই পশ্চাদপদতা। এই সমস্ত দিক মাথায় রেখে শিক্ষক যদি ওদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশে যান, একাত্ম হন, কাছে টেনে নেন, তার অসুবিধের প্রতি সমব্যথী হন, তাহলে নিশ্চিত করে বলা যায় শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর একটা আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠবে, সখ্যতা তৈরি হবে। এটা কে সযত্নে লালন করলে ওই ছাত্রটি তার প্রিয় শিক্ষকের জন্য অনেক কিছু করতে রাজি হবে। অনেকটা কষ্ট করে হলেও পড়াশোনাতেও মন দেবে।এগিয়ে থাকা বা মাঝারি মানের শিক্ষার্থীদের জন্য খুব একটা চিন্তার নেই। পাঠ্যের মধ্যে থেকে প্রশ্ন করতে করতে পাঠ্যের বাইরে চলে যাওয়া, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে পড়াশোনার মিল খুঁজে পেলে ওরা অনেক প্রশ্ন করতে শুরু করবে। এমনকি ধীরগতি সম্পন্ন ছেলেরাও। ওদের করা প্রশ্নের উত্তর ওরাই খুঁজুক শিক্ষক শুধু মাঝেমধ্যে ধরিয়ে দেবেন। এতেই কাজ হবে। এমনও হতে পারে, ওদের করা প্রশ্ন কিংবা প্রশ্ন করতে করতে আপনি এমন একটা প্রশ্ন করেছেন যার উত্তর আপনারই জানা নেই। আপনি সেটা কখনো লুকোবেন না, পরিষ্কার বলুন এর উত্তর তোমরাও খোঁজো, আমিও খুঁজছি, পরে আলোচনা করা যাবে। ওদের পারফরমেন্সকে সবসময় অ্যাপ্রেসিয়েট করুন। এমনকি মাঝেমধ্যে ওদের কাছে শিক্ষক হেরে যাওয়ার ছলনাও করতে পারেন। আসলে ক্লাসে গতি বজায় থাকবে কীভাবে, শিক্ষার্থী সার্বিক উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে কিনা, সে ব্যাপারে সজাগ হতে হবে শিক্ষককেই। চোখ-কান খোলা রেখে নতুন ভাবনা, নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটাতে হবে ক্লাসরুমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে। দিন বদলাচ্ছে, ধাঁচ তো বদলাবেই।মনে রাখতে হবে ছাত্র আছে বলেই শিক্ষকের অস্তিত্ব। পড়াশোনায় শিক্ষার্থীরা যত উৎসাহ নিয়ে ভরিয়ে তুলবে শিক্ষাঙ্গন, ততই শিক্ষকের জয়জয়কার।

[*অনুলিখন : নায়ীমুল হক*]

অধ্যাপক দীপক রঞ্জন মন্ডল
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর,
সিধো-কানহো বিরশা বিশ্ববিদ্যালয়

নিত্য তোমার যে ফুল ফোটে ফুলবনে

ডা.গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

শিক্ষকদের দায় কি শুধুই সিলেবাস শেষ করানো? না, বদলে যাওয়া যুগেও নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার ভিশন দেখান তাঁরাই। যেন জাগ্রত বাতিস্তম্ভ।

মাটির বুকে জেগে রইল বীজ। যদি আলো না পড়ে, বৃষ্টি না ঝরে, তাহলে? মাটি শুকিয়ে গেল, মাঠ ফেটে চৌচির। কী হবে? বিদ্যায়তন হ'ল সেই মাঠ, সেই মাটি। যাতে আলো বাতাসের পথ করে দিয়ে, বারিসিঞ্চনে মাটি ভিজিয়ে দেন শিক্ষক। পোকামাকড়ের খেয়াল রাখেন, সদ্য ফুটে ওঠা লিকলিকে শ্যামল চারাগাছটাকে গরুছাগলের খাদ্য হতে দেন না তিনি।গাছ বেড়ে ওঠে, ছায়া দেয়, জগতের মাঝে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়।

যুগকাল বদলাচ্ছে। আজকের লড়াইয়ের মাঠে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে কি ভাবছেন, কি শেখাচ্ছেন তাঁরা?

শিক্ষকের আদর্শ, সংগ্রাম, সবকিছুই কি বদলে গেছে? শিক্ষকতা কি এখন আর পাঁচটা চাকরির মতোই হয়ে গেছে ? নিত্য নৈমিত্তিক রুটিন বাঁধা ক্লাস, পরীক্ষা, খাতা দেখা! এযুগের শিক্ষক শিক্ষিকাদের কি ছাত্র ছাত্রীদের কোনও প্রয়োজন আছে, নাকি প্রযুক্তির সতত ফসল চলভাষের টাচ্ স্ক্রিন ছুঁয়েই সব শিখে নিচ্ছে ওরা? স্কুল কলেজ কি আজ কেবলমাত্র নিয়ম রক্ষার দায়িত্বে?

দুঃখের হলেও এ কথারও প্রাসঙ্গিকতা আছেই। বিশেষত যখন অতিমারি-উত্তর জীবনধারায় মুখোমুখি সংযোগ ক্ষীণ, টেকনোলজি বাড়তে বাড়তে বিহেভিয়ারাল অ্যাডিকসন তৈরীর কারখানা আজ। মানুষের স্বাভাবিক মনটা আজ সমমর্মিতা হারিয়েছে,সহযোগিতার সতত প্রবাহ প্রায় নিঃশেষ। এমতাবস্থায় সকলেই যখন দিশেহারা, তখন সত্যিই কি সিলেবাস শেষ করানোর বাইরে কতটুকু পারবেন শিক্ষক শিক্ষিকারা?

জেনো র কথা মনে পড়ছে। আথেন্সের বাজারের কাছটিতে পথের পাশেই নিরিবিলিতে জীবনের শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। মেরুদন্ড সোজা রেখে সমাজের মধ্যে মিশে যাওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন তিনি। বহুদিন হ'ল সরস্বতীর সাঁকো বেয়ে লক্ষ্মীর ঘাটে ওঠাটাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয়ে গেলেও ওই সবুজ শ্যামল ছেলেমেয়েদের চরিত্র গঠনের অনেকটা দায় এখনও শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতেই রয়ে গেছে। সমাজ বদলেছে, গতিশীল হয়েছে, তবু ঐ চারিত্রিক কাঠামোটি নির্মাণের ধারা অব্যাহত আজও। সে কাঠামো গড়তে গেলেই কেবল ভাঙতে হয়। কমফোর্ট জোনের শান্তি ভেঙে বেরিয়ে আসতে হয়, প্রশ্ন তুলতে হয়, তবেই নতুন কিছু শেখা যাবে। হাজার বছর ধরে এইই হয়েছে, আজ তার ব্যতিক্রম হবে কেন?মরাল কারেজ, ধৈর্য ধারণের শক্তি, আর চাই এগিয়ে যাওয়ার ভিশনারি! তবেই না নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। তাবৎ শিক্ষক আসলে সেই মন্ত্রের খুঁটি। উত্তাল সমুদ্রে ভেসে যাওয়া নৌকোর দল দিবারাত্রি জাগ্রত বাতিস্তম্ভের মতোই প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষিকাদের ঠিকই খুঁজে নেবে। ওদের একটু ভরসা করতে হবে, শতফুল বিকশিত হবেই।

ডাঃ গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট লেখক ও বিশিষ্ট মনরোগ বিশেষজ্ঞ,
বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা মেডিকেল কলেজ

শিক্ষা : সার্বিক বিকাশ, দক্ষতা, সময়োপযোগী সামাজিক চাহিদা পূরণ

ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির যথোপযুক্ত কান্ডারী করে তুলতে হবে ছাত্র সমাজকে।
পূর্ণমাত্রায় আত্মনিয়োগ করতে হবে আমাদের।

শিক্ষা বিজ্ঞানে স্বাভাবিকভাবেই "শিক্ষা " কে নানানভাবে সংজ্ঞায়িত করা হলেও যুগের পরিবর্তন ও প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার অভিমুখ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণভাবে পরিচালিত হয়। এই উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন বোর্ড বা সংসদ বিভিন্ন শ্রেণির জন্য বিভিন্ন ধরনের বিষয় ও পাঠক্রমের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি কথা বহু চর্চিত ও বিবেচিত : তা হ'ল কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযথ দক্ষতা ও যোগ্যতার বিকাশ। যে ছাত্র বা ছাত্রীটি আজ মাধ্যমিক পরীক্ষার দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, হয়তো বয়সে ১৫ বা ১৬ বছর বয়সী, সে বা তারা যখন কর্মজীবনে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন পদে আবেদন জানাবে তখন যদি তাদের বয়স ২৫,২৬ বা ২৭ বছর হয় তবে আগামী ১০ বা ১২ বছর পরে কোন্ দক্ষতা ও যোগ্যতায় তৎকালীন সামাজিক প্রয়োজন তারা মেটাতে পারবে তা কি বর্তমান শিক্ষাচর্চার মধ্যে আমরা ভাবতে পারছি? নারীর বর্তমান স্বাস্থ্য যেমন আগামী দিনের সুস্থ ও নীরোগ সন্তানের জন্ম দিতে পারে, তেমনই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে বর্তমান শিক্ষাদানের সুস্বাস্থ্যের উপর। আজকের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সঠিক ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপই পারে আগামী দিনের সুস্থ ও সুউন্নত আর্থ-সামাজিক পরিবেশ তৈরি করতে। সিলেবাস বা পাঠক্রম তো প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের সোপান বা সিঁড়ি মাত্র। কিন্তু যে গুণগুলি বা দক্ষতাগুলি অর্জন করলে আগামী দিনের সামাজিক চাহিদাগুলির সঠিকভাবে প্রতিকার করা যায়, তা কি সম্পন্ন হচ্ছে? শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানের প্রতিযোগিতায় আটকে না থেকে ভবিষ্যতের কাণ্ডারী নির্মানের সহায়ক হবে। এক্ষেত্রে বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেই দিশা উপলব্ধি করে নিজেদেরও ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরির যথোপযুক্ত কাণ্ডারী করে গড়ে তুলুন। অনেক অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকতাকে জয় করার দৃঢ় ও নির্ভিক মানসিকতার পরিচয় দিতে হবে। সমাজের নানান ধরনের প্রয়োজনের গুরুত্ব মাথায় রেখে সব ধরনের পারদর্শীতার বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। সরকার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও সকল বিষয়ের সামাজিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করতে হবে। নতুবা কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে আমাদের সামাজিক প্রয়োজন সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে, অনেক বিষয় ও পারদর্শীতার গুরুত্বের অপমৃত্যু হবে। সামাজিক অস্থিরতা বাড়বে। আজকের শিক্ষা আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হতে পারে না। তাই যেকোনো স্থানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষকে বিশ্বনাগরিক তৈরির দক্ষতাগুলি মাথায় রেখে চাহিদা পূরণের শিক্ষাদানে ব্রতী এবং পূর্ণ মাত্রায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সুষ্ঠু 'এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম' গড়ে তোলা প্রয়োজন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ও যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষজনকে বর্তমান ছাত্র ছাত্রীদের সংস্পর্শে অন্ততঃ ওয়েবিনারের মাধ্যমেও আনার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োগমূলক দক্ষতা অর্জনের জন্য ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে কর্মশালার ব্যবস্থা আজ ভীষণভাবে প্রয়োজন। কেবল পুঁথি সর্বস্ব জ্ঞান আগামী দিনের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হবে না। প্রকৃত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের বাধাগুলিকেও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। জীবাণুকে সনাক্ত না করলে রোগ প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার মাধ্যমে যে গুরুত্বপূর্ণ মানসিক পুষ্টি হতে পারে তার যেকোনোরকম বাধাগুলিতে সমূলে উৎপাটিত করতে হবে। Prevention is better than cure.

ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
শিক্ষারত্ন ও রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক,
বিশিষ্ট লেখক ও প্রধান শিক্ষক, পাঠভবন ডানকুনি

ভাষা নিয়ে ভাসা-ভাসা কথা

দিব্যগোপাল ঘটক

যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন শিশুদের ভাব প্রকাশের পদ্ধতি কিন্তু একই। ধাপে ধাপে শিশুকে কী করে তা ভাষায় প্রকাশে উন্নীত করা যায়..

বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষাতে ভাষার দক্ষতা ও নির্মিতি সামর্থ্য গড়ে তোলার পদ্ধতি প্রায় একই রকম। তার বড়ো কারণ হলো দুটো ভাষাই একই গোষ্ঠীভুক্ত এবং তাদের শব্দগত ও বাক্যের গঠনগত শৈলী ও নির্মাণ প্রকরণ খুব বেশি ভিন্ন নয়। ভাব প্রকাশের পদ্ধতিও অনেকাংশে একই রকম। তবে এটা ঠিক যে ইংরেজি ভাষা বাংলার চেয়ে অনেক বেশি সহজ, সরল এবং নিয়ম-নির্ভর।

আজকের আলোচনায় এই দুটি ভাষা শিক্ষার মধ্যে পদ্ধতিগত যে মিল আছে তা নিয়ে কিছু কথা বলবো। বাংলা ও ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রে চারটি মৌলিক সামর্থ্যের উপর ভাষা শিখন দাঁড়িয়ে আছে।

- শ্রবণ ও অনুধাবন
- পঠন ও অনুধাবন
- অর্থপূর্ণ কথন
- অর্থপূর্ণ লিখন

চারটির মধ্যে প্রথম দুটি গ্রহনধর্মী দক্ষতা এবং শেষের দুটি প্রকাশধর্মী। যখন শিশুর বয়স আড়াই বা তিনের নীচে তখনই তাকে শ্রবণ ও পঠন বিষয়ে নানান কৃত্যালির মুখোমুখি করা যায়। আবার ৯-১০ বছর পর্যন্ত বাকি দুটি সামর্থ্যকে ছয়টি স্তরে ভেঙে নেওয়া যায়।

ক) **প্রারম্ভিক স্তর (তিন বছরের আগে)** : অজস্র গল্প শোনাতে হবে। প্রথমের দিকে নিতান্তই মজার জন্য। পরে গল্পগুলো নিয়ে দু-একটা আলোচনা করা যায়। শিশুর পছন্দকে মর্যাদা দিয়ে। দেখতে হবে কাহিনিটা বুঝতে পারছে কিনা, চরিত্রগুলোর বিশেষত্ব আন্দাজ করতে পারছে কিনা, গল্পটাকে চোখে নাটকের মতো দেখতে পাচ্ছে কিনা। শেষে যা ঘটলো তা ভালো হলো না খারাপ হল। এই সব বিষয়ে শিশুর মতামত নেওয়া দরকার। পুরোপুরি বাংলায় অথবা দু'চারটে শব্দ ইংরেজি ব্যবহার করে গল্পটা বলা যায়। ইংরেজি শব্দগুলোকে বারবার বলে ও আঙ্গিক অভিনয় করে বোঝাতে হবে। সরাসরি মানে বলার দরকার নেই।

এই সময়ে পড়া মানে হল ছবি পড়া, ছবিগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য ও বৈসাদৃশ্য নির্বাচন করা। অসম্পূর্ণ ছবি হলে পূর্ণাঙ্গ গল্পের খোঁজ করা, প্রকৃতিকে পড়া, নিবিড় পর্যবেক্ষণ করতে শেখানো। প্রতি অংশকে চিনতে এবং Audio Visual Materials দেখে বিভিন্ন ভাবে প্রতিক্রিয়া দিতে শেখা। English Picture Book ব্যবহার ইংরেজিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এখানে অনুধাবন, পর্যবেক্ষণ এবং কথনের সামর্থ্য বিকাশের সুযোগ তৈরি হয়। এই সময়ে শিশুকে পরের পাঁচটি স্তরে দ্রুত নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

ইংরেজিতে Rhymes, Instruction দিয়ে মজার খেলা পরিচালনা, আশেপাশের Object, Animals, মানুষ ইত্যাদি ইংরেজিতে চর্চা করানো যায়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে বাংলা ও ইংরেজি পাশাপাশি পরিচালনা করতে হবে।

খ) **দ্বিতীয় স্তর (মূলত তিন বছরের জন্য)** : এই বয়সের শিশুদের জন্য আগের স্তরের কাজগুলোর দুরূহতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পঠনের ক্ষেত্রে বর্ণ ও

অক্ষরের সঙ্গে পরিচিতি আনতে হবে। বর্ণ ও স্বরচিহ্ন যুক্ত করে এবং একাধিক বর্ণ যোগ করে কীভাবে পরিচিত শব্দ তৈরি হয়ে যায় তার জন্যে নানান খেলা তৈরি করতে হবে। পরিচিত সরল শব্দ থেকে অজানা শব্দ ও শব্দগুচ্ছে যাওয়ার খেলা। দুই বা তিন শব্দযুক্ত বাক্যও এখানে আসতে পারে একটু শেষের দিকে। এখানে ইংরেজি ইন্সট্রাকশনগুলিকে আরো নির্দিষ্ট হতে হবে। প্রশ্নবোধক বাক্য শোনার এবং প্রশ্নে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে কীভাবে পূর্ণ বাক্যে তার উত্তর দিতে হয়, তার কৌশলও শেখাতে হবে। এখানে উপকরণ হিসেবে আসে শব্দ কার্ড, শব্দগুচ্ছের কার্ড, ছবি ও শব্দের কার্ড, শব্দ সাজিয়ে ছোট বাক্য গঠনের জন্য কার্ড ইত্যাদি। ইংরেজি এবং বাংলায় উভয় ক্ষেত্রেই। এখানে বিভিন্ন পদ মিলিয়ে বাংলায় অন্তত হাজার শব্দ এবং ইংরেজিতে ৫০০ শব্দ নিয়ে কাজ করতে হবে। এগুলির একটি তালিকা বানিয়ে শিক্ষকদের কাজ শুরু করতে হবে।

এই স্তরে দেখে দেখে লেখা বা কারসিভ রাইটিং -এর সূত্রপাত ঘটানো দরকার। তার আগে বিভিন্ন প্যাটার্ন ড্রইং করার দিকে নজর দিতে হবে। শেষের দিকে letter গুলি লেখার প্রারম্ভিক কাজ শুরু করা যেতে পারে। ছবি আঁকায় উৎসাহ দিতে হবে। পর্যবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রজেক্ট কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

গ) **তৃতীয় স্তর (মূলত চার বছরের জন্য):** আগের দুটি স্তরে গল্প শোনা (ইংরেজি ও বাংলাতে), Audio Visual Show দেখা, গল্প শোনানো, ছবি দেখে কাহিনি বানানো, সূত্র থেকে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ তৈরি করা, ছড়া বলা, ছবি আঁকা, কার্ড নিয়ে নানান ধরনের খেলা খেলতে খেলতে বাক্যে পৌঁছে যাওয়া -এই সমস্ত কাজ তারা করতে থাকবে। তার সঙ্গে বাক্যের মধ্যে আরও শব্দ যোগ করে বড় করা, নতুন নতুন শব্দ যোগ করা, একই শব্দ ব্যবহার না করে সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা, বাক্যটাকে বিভিন্ন আঙ্গিক থেকে বলে মজা করা, বাক্যকে ভিন্ন অর্থে বলার অভ্যাসও করানো যেতে পারে। প্রথমে সহজ, পরে একটু জটিল। এই স্তরে ছোট ছোট বাক্য পরপর যোগ করে অর্থপূর্ণ পাঠ্যাংশ তৈরির চেষ্টা করতে হবে। ছবি দেখে বাক্য সাজানোর অভ্যাস করা যেতে পারে। তবে সব বাক্যে চার-পাঁচটির বেশি শব্দ থাকবে না। প্রতি পাঠে একটি দুটি করে দুরূহ শব্দ ঢোকাতে হবে। কোনো শব্দের অর্থ সরাসরি বলা যাবে না। বরং তাদেরকেই সেটি আবিষ্কারের মজায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এই সমস্ত কাজ কার্ড ও ছবি প্রয়োগ করে সম্পন্ন করলেই ভালো হয়। এই স্তরে গণিত আসবে ভাষার ধারণা নিয়ে। এক থেকে অন্তত ৫০ পর্যন্ত সংখ্যার ভাষাগত ধারণা তৈরি করতে হবে খেলার ছলে। নানান উপকরণ দিয়ে। তারা যেন এটিকে আলাদা কোনো বিষয় বলে মনে না করে। যোগের এবং বিয়োগের সহজ খেলা ও গল্প ব্যবহার করলে তারা যোগ বিয়োগের ধারণায় দৃঢ় হয়ে উঠবে।

ঘ) **চতুর্থ স্তর (মূলত ৫ বছরের শিশুদের জন্য):** আগের তিনটি স্তরে চর্চা করা প্রক্রিয়াগুলিকে আরো উন্নত, দুরূহ ও সমস্যাপূর্ণ করে তুলতে হবে। সমস্ত কাজ (task) হবে চ্যালেঞ্জিং (ভেবে-বুঝে করতে হবে)। শোনা, বলা, পড়া ও লেখার ক্ষেত্রে তাদের এবার ফরমাল প্যাটার্নের সঙ্গে পরিচিতি ঘটাতে হবে। Reading Card- এ ছবিসহ গল্প একসাথে দিতে হবে। ওই কার্ড থেকে নানান প্রশ্ন নিজেই করবে এবং তার উত্তর নিজেই বের করতে শিখবে। কার্ড থেকে যা বুঝল তা নিজের কথায় বলার চেষ্টা করবে। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ক্ষেত্রেই।

গল্পের মধ্যে মূল চরিত্র, মূল শব্দ, মূল কথা বলার মতো একটি-দুটি শব্দ বের করতে পারবে। এখানে Audio Visual Material দেখিয়ে একই আলোচনা করা যেতে পারে। পরিবেশ, খেলাধুলা, প্রাণী জগৎ, সমুদ্র বা তার তলদেশ, মহাকাশ, মানুষের দেহ, দেহের অভ্যন্তরে প্রত্যঙ্গ ইত্যাদি নতুন নতুন বিষয়কে Audio Visual Material-এ আনা যায়। এগুলি নিয়ে আলোচনা কখনো ইংরেজিতে কখনো বাংলাতে

আলাদাভাবে করা যায়। শুরুতে মিশিয়ে, পরে আলাদা আলাদা করে ব্যবস্থা করতে হবে।

এই স্তরে 'মানস মানচিত্র' (মাইন্ড-ম্যাপিং) চর্চা শুরু করা যেতে পারে। যে কোনো বিষয় নিয়ে ভাবতে বলে তা নিয়ে বিক্ষিপ্ত শব্দ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তুলে নিয়ে এসে সেগুলিকে কয়েকটি কনসেপ্ট বা 'উপভাব' এ বিভক্ত করা এবং তা নিয়ে বলতে বলা বা লিখতে বলার সহজ চর্চা শুরু করা যায় এই স্তরে। যেমন- বাড়ির সবজি বাগান।

ঙ) **পঞ্চম স্তর (মূলত ছয় ও সাত বছরের শিশুদের জন্য):** এই স্তরে একটি শিশু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। এই স্তরে শিশুদের জন্য নিম্নলিখিত কৃত্যালি আবশ্যিক।

এক) গ্রন্থাগার নির্মাণ: পাঠ্যবই দিয়ে যা সম্ভব নয় সেটি গ্রন্থাগার কর্মসূচির মাধ্যমে সম্ভব। এই কাজে অন্তত ৫০০ বইয়ের একটি সম্ভার তৈরি করতে হবে। এই বইগুলি প্রতিটি শিশু দু বছরের মধ্যে পড়ে শেষ করবে। বইগুলির মধ্যে অন্তত তিনটি স্তর থাকবে। প্রথমতঃ যারা বানান করে হলেও কিছুটা পড়তে পারে, দ্বিতীয়তঃ যারা পড়তে পারে ধীরে হলেও, তৃতীয়তঃ যারা ভালো পড়তে পারে। এদের উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ের বই সংগ্রহ করতে হবে। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, চিলড্রেন বুক ট্রাস্ট ছাড়াও বাংলা ও ইংরেজিতে নানান প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে।

নজর রাখবেন :

- শিশুর নিজে নিজে পড়ার আগ্রহ যাতে বাড়ে।
- কোনও শব্দের অর্থ বলে দেওয়া যাবে না।
- পড়া শেষ হলে শিক্ষক বইটি নিয়ে আলোচনা করবেন।
- বইটির বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে এমন কিছু বিষয় নিয়ে এ.ভি. মেটেরিয়ালস দেখানো ও আলোচনা করা যেতে পারে। কিংবা মাইন্ড-ম্যাপিং করাও যেতে পারে।

দুই) শিশুকে চিন্তা করতে শেখানোর জন্য এবং চিন্তার সঙ্গে যুক্ত উপযুক্ত শব্দ ও শব্দগুচ্ছ এর পর্যায়ক্রমিক নেটওয়ার্ক তৈরি করিয়ে দেওয়ার জন্য মাইন্ড-ম্যাপিং খুব উপযুক্ত পদ্ধতি। ধরুন, শিশুরা বর্তমানে মৌমাছি বা মৌচাক নিয়ে কোন গল্প পড়তে চলেছে। এই বিষয়টিকে central theme ধরে নিয়ে শিশুদের কাছ থেকে ওই সংক্রান্ত কুড়ি-পঁচিশটা শব্দ প্রথমে তুলে আনতে হবে। ওই শব্দগুলিকে চার-পাঁচটি ক্লাস্টারে বিভক্ত করে প্রতিটিতে আরো শব্দ ভাবতে বলতে হবে। পরে ক্লাস্টার ধরে ধরে শব্দসূত্রগুলি নিয়ে ওদের কিছু কথা বলতে হবে এবং লিখতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার মতো সমস্ত সামর্থ্য নিয়ে চর্চা করা সহজ হয়।

তিন) Audio Visual Materials এর ব্যবহার এই স্তরে পরিকল্পিতভাবে করতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে প্রচলিত মেটেরিয়ালগুলি খুঁজে শ্রেণিকক্ষে দেখাতে হবে। সে ক্ষেত্রে শিক্ষকের পরিকল্পিত পাঠ-পরিকল্পনার সঙ্গে ওই উপকরণের ব্যবহার সাযুজ্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে হবে। হঠাৎ কোনো সিনেমা শো-এর মতো দেখানো চলবে না। দেখানোর সময় কিছু অভিনবত্ব আনাও যায়। যেমন, একসাথে সবটা না দেখিয়ে কিছুটা দেখিয়ে শিশুদের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত ঘটানো যায়। মাইন্ড-ম্যাপিং শুরু করা যায়। সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে শব্দ ও শব্দগুলিকে একসাথে লিখে রাখা যায়। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য শিশুদের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করা যায়।

চার) সৃজনশীল কৃত্যালি: এই স্তরে প্রতি বিষয়ে সৃজনশীল কৃত্যালির সংযোগ ঘটানো জরুরি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নাটক তৈরি করা বা করানো, গান ও ছড়া চর্চা এবং ছবি আঁকাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে যে মূলভাব ও মূল্যবোধ আছে তা আরো নিবিড়ভাবে হৃদয়ে রোপন করতে এই কৃত্যালি জরুরি। তাছাড়া কথা বলা, পড়া, লেখা এবং শোনার কাজও আনন্দদায়কভাবে করা যায়।

পাঁচ) শিশুর পাঠ্য বইয়ের অন্তর্গত বিষয়গুলিকে পাঠ্য বই পড়ানোর চিরাচরিত পদ্ধতিতে

না করে শিক্ষককে পাঠগুলিকে কৃত্যালিতে পরিণত করার কৌশল শিখতে হবে। পাঠ্য বইয়ের একটি গল্প কীভাবে লার্নিং টাস্ক-এ পরিণত হয় তার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ওই টাস্কটিকে কীভাবে সাজানো যায় তার জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, ওই টাস্কটিকে কীভাবে মূল্যায়নের tool-এ পরিবর্তন করা যায় তাও শিখতে হবে শিক্ষকদের। তাহলেই শিক্ষকেরা শিশুর সামর্থ্যগুলির বর্তমান স্ট্যাটাস সহজে চিহ্নিত করতে পারবেন। ছয় এবং সাত বছর বয়সে এইসব কৃত্যালিগুলিকে সহজ থেকে কঠিন এই গ্রেডে সাজিয়ে নিয়ে শিশুদের উপর প্রয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে:

ক) দলগত শিখন

খ) উপযুক্ত শিখন

গ) শিক্ষকদের টাস্ক তৈরির দক্ষতা

ঘ) শিক্ষকদের মূল্যায়ন করার দক্ষতা

ঙ) মূল্যবোধ বোঝানোর জন্য আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি

ছয়) **শেষ স্তর (৮ থেকে ১০ বছরের শিশুদের জন্য):** এ সময় তারা তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী থাকে।

পূর্বে উল্লেখিত সমস্ত কৃত্যালিগুলির মান ও দুরূহতা বৃদ্ধি পাবে এই স্তরে। আরো বেশি জটিল এবং চ্যালেঞ্জিং হবে। তবে পাঠ্য বইয়ের অধ্যায়গুলিকে এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনার মধ্যে আনতে হবে যাতে নিম্নলিখিত সামর্থ্যগুলির চর্চা বৃদ্ধি পায়:

পঠন দক্ষতা, শ্রবণ ও অনুধাবন দক্ষতা, অর্থপূর্ণ পঠন দক্ষতা, অর্থপূর্ণ লিখন দক্ষতা, পর্যবেক্ষণ ও কখন-লিখন দক্ষতা, শিশুর সৃজনধর্মী ক্ষমতার প্রকাশ দক্ষতা, শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ বিকাশের ক্ষমতা, বাস্তব জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার দক্ষতা।

এই দক্ষতা বৃদ্ধির ফলে পঞ্চম শ্রেণির শিশুদের মধ্যে যে যে আচরণ পরিবর্তন হবে:

• বাংলায় একশো কুড়িটি শব্দের একটি পাঠ্যাংশকে এক মিনিটে পড়ে মানে বুঝতে সক্ষম হবে।

• ইংরেজিতে ৮০টি শব্দের পাঠ্যাংশ ১ মিনিটে পড়ে মানে বুঝতে সক্ষম হবে।

• যেকোনো গল্পের বই পড়তে ভালবাসবে।

• যে কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর নিজের মতো করে উত্তর দিতে সক্ষম হবে। যে কোনো টেক্সটের অন্তর্গত অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারে সক্ষম হবে। ওই টেক্সটের মূল কথা দু একটি শব্দে বলতে পারবে।

• যে কোনো শব্দহীন ছায়াছবি দেখে কাহিনি বুঝতে পারবে এবং তার নিজের ভাষায় বলতে সক্ষম হবে। যে কোনো দুরূহ শব্দের সম্ভাব্য অর্থ বলতে সক্ষম হবে।

সংকেত ও সূত্র বোঝার ক্ষমতা থাকবে। বাংলায় প্রায় ৫০০০ এবং ইংরেজিতে প্রায় ৩০০০ কার্যকরী শব্দভাণ্ডার তৈরি হয়ে যাবে।

যে কোনো ছবি দেখে তার ব্যাখ্যা করতে পারবে। তুলনা করা, সাদৃশ্য খোঁজা, পছন্দের অংশ বাছাই করার মতো মেধাগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করা, কার্যকারণ সম্পর্ক খোঁজা, ঘাটতি বা গ্যাপ নিরূপণ করতে পারা ইত্যাদি।

শুধু পড়া বলা বা লেখা নয়, শিশুকে কার্যকরীভাবে সাক্ষর করে তুলতে তার মেধা শক্তি, বোধশক্তি এবং চিন্তাশক্তির বৃদ্ধিও ঘটাতে হবে। এই চর্চার মধ্যে সবটাই হতে পারে।

দিব্যগোপাল ঘটক
বিশিষ্ট লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টর,
শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পড়া শেখা - লেখা শেখা - বলা শেখা

মেচবাহার সেখ

গোড়ায় গলদ। ভাষা-ই যদি না আসে মুখে, হৃদয় জাগবে কীভাবে?
বর্ণ চেনা থেকে শুরু করে শব্দের উচ্চারণগত ফারাক শেখাতে হবে একদম শৈশব থেকে।

শিশুরা ছোট বয়স থেকে কীভাবে কথা বলা শিখবে, পড়া শিখবে এবং লেখা শিখবে এ বিষয়ে কিছু বলতে গেলে পৃথিবীর নানা মনীষী শিক্ষাবিদ দার্শনিকগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা প্রসূত কী ভাবনা, তত্ত্ব ও বাস্তবতা আমাদের জন্য রেখে গেছেন সেগুলো দিয়ে শুরু করলে আমাদের জানা ও বিশ্বাসটা বোধহয় মজবুত হয়। কারণ আমরা সীমিত জ্ঞানের মানুষ। প্রথমে রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই শুরু করা যাক। তিনি তার 'ধর্মশিক্ষা' প্রবন্ধের এক জায়গায় বলছেন "একটা পাথরকে দেখাইয়া বলিতে পারো ইহাকে যেমনটি দেখিতেছি ইহা তেমনই, কিন্তু একটা বীজ সম্পর্কে সে কথা খাটে না। তাহার মধ্যে এই একটি আশ্চর্য রহস্য আছে যে, সে যেমনটি তাহার চেয়ে অনেক বড়।" বটবৃক্ষের ক্ষুদ্র বীজ আর তার সমতুল একটি পাথরকুচি সমান নয়। বটবীজের মধ্যে বৃহত্তম বটগাছটি ঘুমিয়ে আছে। আমাদের শিশুরাও ঠিক তাই। সদ্যোজাতকে যেমনটি দেখি সে দেখার মধ্যে তার বৃহত্তমটা দেখা যায় না। তাকে পরিচর্যা করলেই সে তার বৃহত্তম রূপটা দেখাতে পারে। যেমনটি বীজের পরিচর্যা করলে বৃহৎ বটগাছটিকে পাই।

শিশুকে পরিচর্যা ও তৈরি করতে অর্থাৎ তার শেখা, বলা, লেখা কেমন ভাবে হবে তা প্রথমেই শুরু হয় মায়ের কোল থেকে তারপর পরিবার, বৃহত্তর সমাজের নানা শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। সুতরাং দায় নানা স্তরে।

এই শিখন প্রক্রিয়াটা বুঝতে আবার এক মনীষীর সাহায্য নেওয়া যাক। তিনি হলেন সোভিয়েত রাশিয়ার বিশ্বখ্যাত শিক্ষা গবেষক লেভ সেমিওনভিচ ভাইগোৎস্কি। শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি যে তত্ত্বের অবতারণা করলেন তার পরিচিত নাম হল Theory of Constructivism বাংলা করলে দাঁড়ায় 'জ্ঞান গঠনের তত্ত্ব'। জ্ঞান গঠন তত্ত্বের মূল কথা হল- শিখন বা শেখা একটি প্রক্রিয়া (লার্নিং ইজ এ প্রসেস)। শিশু শেখে। প্রতি মুহূর্তে শেখে। দেখে শেখে, শুনে শেখে। এটা একটা নৈমিত্তিক প্রক্রিয়া। আমি, আপনি না শেখালেও, না দেখালেও সে নিজের মতো করে দেখে শুনে তার মতো শিখবে। এ শেখা আটকানো যাবে না। কিন্তু আমরা কি চাই? শিশু যা কিছু শিখুক, যা কিছু দেখুক এবং তার মতো ভাবুক? তাহলে তো তাকে সমাজের মতো, পরিবারের মতো, রাষ্ট্রের মতো তৈরি করা হল না। বর্ষাকালে আগাছা বা লতাপাতার মতো বেড়ে উঠলো। এটা তো কাম্য নয়।

আমরা চাই শেখার জন্য কাম্য শিক্ষা। সেটা বলার ক্ষেত্রে, শেখার ক্ষেত্রে, লেখার ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রেই হতে হবে।

প্রথম কথা শেখা বা কথা বলা দিয়েই শুরু করা যাক। ভাইগোৎস্কি তাঁর জ্ঞান গঠনের তত্ত্ব বলছেন, শিশুর শেখাটা হয় একটা জানার উপর আরেকটা জানা। সেটা হয় নতুন জানা। এই নতুন জানার উপর আরেকটা নতুন জানা। ঠিক ইঁট গাঁথার মতো। একটা ইঁটের উপর আরেকটা ইঁট গাঁথা। এই ভাবেই ইমারত তৈরি হয়। জ্ঞানের ইমারত। শিশু কথা বলা শেখে শুনে শুনে। শব্দভাণ্ডার তৈরি হয় শুনে। বাড়ির বড়োরা চিরাচরিত ভাবে তাকে প্রথম একটা একটা শব্দ শেখায়, যেমন বাবা- দাদা- মামা- নানা ইত্যাদি। তাহলে ভাষা শেখার ক্ষেত্রে যা দাঁড়ালো, তা হল, ভাষা শেখানোর

প্রথম দায় বর্তায় পরিবারের উপর। শুরুতে শিশুরা বড়োদের মতো স্পষ্ট উচ্চারণ করতে পারে না। কারণ শব্দটা তার অজানা। দ্বিতীয়ত জীভ ও ঠোঁটের উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তখনও আসেনি। তাই আমরা বড়রা তার এই অপারগতা বা ইম'ম্যাচিউরিটি বুঝে শব্দ বা ভাষা শেখানোর সময় সহজ করে শেখাতে গিয়ে শব্দের বিকৃত উচ্চারণ শেখাই। ক্রমান্বয়ে সেটাই তার মাথায় থেকে যায়। যাকে বলে গোড়ায় গলদ। এক্ষেত্রে তাহলে দায় বর্তায় পরিবারের উপর। তাহলে আমরা কী করতে পারি? আমরা শিশুদের ছোট ছোট শব্দ যা তার জীভ ও ঠোঁটের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার মধ্যে থাকবে সেটা বুঝে স্পষ্ট উচ্চারণটাই শেখাবো। শব্দকে বিকৃত করে নয়। প্রথম শেখাতে হবে একটা মাত্র শব্দ দিয়ে যেগুলো সহজে উচ্চারণে আসে। যেমন মা, না, পা, দা। তারপর আসতে পারে বাবা, দাদা, মামা, নানা, পাপা ইত্যাদি। ঠিক এইভাবে বাক্য গঠন শেখাতে হবে। এটা হল শিশুকে পরিকল্পিতভাবে শেখানো। জ্ঞান গঠনের তত্ত্ব অনুসারে বলা হয়, একটা জানার উপর আরেকটা জানা। যেমন- প্রথম জানতে হয় মা, তার এই মা জানার উপর আরেকটা জানা যোগ হয় মামা। ঠিক ইঁট গাঁথার মতো।

এইখানে প্রশ্ন হল- সব অভিভাবক কী এভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত? না, তা নয়। আর নয় বলেই শিশুরা ভালোভাবে ভাষা শেখে না। শেখার তারতম্য দেখা যায়।

শিশু অবস্থায় এভাবে শেখার পর যখন সে বড়ো হয়, তখন তার দায় বর্তায় শিক্ষক কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর। আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগ মানুষ বাংলাভাষী হলেও বিভিন্ন জেলায় ভাষার একটা আঞ্চলিকতা আছে। মান্য ভাষায় (স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজে) যদি বলি আসবো, তবে কোনো জেলায় তা বলা হয় আইসবো বা আসুম। আঞ্চলিকতার কারণেই এই অসুবিধা। এই ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষা তার কাছে মাতৃভাষা হলেও যখন সেই শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করবে তখন তাদের মান্য ভাষায় উচ্চারণ করতে এবং অর্থ বুঝতে অসুবিধা হবে। শিক্ষক এবং অভিভাবকদের এই দিক বিবেচনা করে দুটো ভাষার (মান্য ভাষা ও স্থানীয় বা মাতৃভাষা) মধ্যে সমন্বয়ে ঘটাতে হবে।

দ্বিতীয়ত শিশুদের স্পষ্ট উচ্চারণ করতে শেখাতে হবে। কোন বর্ণে কোন শব্দে কোনখানে জোর দিতে হবে পূর্বেই সেটা শুরু থেকে শেখাতে হবে। যেমন 'পর' আর 'পড়' শব্দের উচ্চারণগত ফারাক আছে। ধৈর্য্য এই শব্দটা অনেক শিশু বলে ধৈয্য। বড়োরাও অনেকে এই ভুল করে। এইসব পার্থক্য বোঝানো ও শেখানো দরকার ছোট থেকেই। এরকম ভাবে দেখা যায় 'আসার' (come) আর 'আষাঢ়' উচ্চারণের পার্থক্য থাকলেও আমরা শিশুদের শব্দ ও বর্ণের উচ্চারণ ঠিকমতো শেখাই না।

সুতরাং বর্ণ চেনা থেকে শুরু করে শব্দের উচ্চারণগত ফারাক শৈশব থেকে অত্যন্ত নিপুণভাবে না শেখালে অনেক ধরনের সমস্যা হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হল বানান ভুল। যেমন 'তুমি পরে এসো। আবার বলি 'তুমি পড়ে এসো। বর্ণের উচ্চারণে গোলমাল থাকলে শিশুরা এই ধরনের বাক্যের ক্ষেত্রে বানান ভুল করে ফেলে। এখানেই বর্ণ শেখানোর সময় ফোনেটিক লার্নিং (phonetic learning) এর উপর শিশুকে ও অভিভাবককে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। শিশু কী শুনছে এবং কীভাবে তা উচ্চারণ করছে যা খুঁটিয়ে দেখা খুবই জরুরি। প্রয়োজনে সংশোধন করে দেওয়ার ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। কিন্তু সমস্যা এখানেই, আমাদের অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্যেই যদি এই উচ্চারণের সমস্যা থাকে সে ক্ষেত্রে শিশুদের কী হবে?

এছাড়াও শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে এখনও বর্ণের বিকৃত উচ্চারণের অভ্যাস থেকে গেছে। ধ-কে সরাসরি ধ-না বলে কাঁধে পুঁটলি 'ধ' বলা। 'র'-কে সরাসরি 'র'-না বলে 'ব'-শূন্য 'র' বলা, 'দ' কে হাটুভাঙ্গা 'দ' বলা ইত্যাদি। শিশুরা বর্ণকে নির্দিষ্ট নাম দিয়ে না শিখে যদি বিকৃত উচ্চারণের মধ্য দিয়ে শেখে তবে তাদের বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা হবে। যেমন– যদি গাধা উচ্চারণ করতে হয় তবে শিশু যদি বলে 'গ'-এ আকার কাঁধে পুঁটলি 'ধ'-এ আকার তাহলে সব মিলিয়ে উচ্চারণে সহজে গাধা শব্দটি উচ্চারিত হতে চাইবে না। অনেকগুলি ফোনেটিক মিলে একটা জগাখিচুড়ি মার্কা শব্দ তৈরি হতে চাইবে এবং তা আরো জটিল হয়ে শিশুর মাথায় পাক খেতে থাকবে, ফলে খুব

স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চারণে কষ্ট পাবে।

অথচ আমরা খুব সহজভাবে এগুলো শিখিয়ে দিতে পারি, শুধু প্রয়োজন একটু সচেতনতা। শিক্ষককে শিশু মনের স্তরে পৌঁছে তার সমস্যাটা বুঝতে হবে। এতে কিন্তু শিশুরা সহজে শিখবে, উচ্চারণ পরিষ্কার হবে, পড়তেও আনন্দ পাবে। নতুবা সমস্যা আরো গভীরতর হবে।

লেখা শেখা - এবার আসা যাক লেখা শেখানোর প্রশ্নে। লেখার ক্ষেত্রেও পড়ার মতো সহজ থেকে কঠিন এর দিকে যেতে হবে। একটা জানা জিনিসের উপর নতুন জানা যোগ করতে হবে। শিশুদের তিন বছর বয়স থেকে স্বাধীন ভাবে কিছু আঁকিবুকি করতে দিতে হবে। এতে পেন্সিল ধরার উপর তার আধিপত্য কায়েম হবে। ধীরে ধীরে শিশুকে নির্দিষ্ট ভাবে কিছু দাগ টানা, সোজা রেখা, বাঁকা রেখা, গোল করা ইত্যাদি করতে দিতে হবে। তার মনের মতো। কোন চাপ দেওয়া নয়। ক্রমান্বয়ে তার তৈরির আঁকিবুকির অংশ যোগ করলে কেমন ভাবে একটা বর্ণ তৈরি হয়ে যেতে পারে সেটা তাকে দেখাতে হবে। শিশু যখন টুকরো টুকরো রেখাকে যোগ করে হঠাৎ বর্ণ লিখে ফেলেছে দেখবে তখন সে লেখার আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠবে। আরো লিখতে চাইবে সৃষ্টির আনন্দে। অনেকেই ছোট থেকে বর্ণ লিখে তার উপর দাগ বোলাতে দেন। শিশু যখন পেন্সিলই ঠিকমতো আয়ত্ব করতে শেখেনি, তখন একটা কঠিন বর্ণের উপর আঙুল ঘোরানো তার পক্ষে আরও কঠিন হয়। সেক্ষেত্রে আঁকিবুকি দিয়ে শুরু করে তারপর সেসব যোগ করে বর্ণ লেখা অনেক সহজ হয় এবং শিশুর কাছে তা আনন্দদায়ক হয়। দাগ বোলানো শিশুর কাছে কঠিন হয়। এটা অনুকরণীয় কাজ, সৃষ্টির আনন্দ নেই। নিজের আবিষ্কার থাকে না। স্বাধীনতাও থাকেনা।

ক্রমান্বয়ে শিশুদের বর্ণ লেখার সময় সঠিক আকৃতির বর্ণ লেখানো শেখাতে হবে। শিশু কোনরকম একটা বর্ণ লিখে দিলে তা পাঠ্য বইয়ের বর্ণের সঙ্গে তুলনা করে তাকে দেখাতে হবে তার বর্ণ লেখাটা কোনখানে ভুল হয়েছে। এই প্রক্রিয়ায় লেখার মূল্যায়নটাও হয়ে যায়। মাত্রা, যতি চিহ্নের ব্যবহার বুঝিয়ে ভালো করে শেখাতে হবে। কোন বর্ণে পূর্ণমাত্রা, কোন বর্ণে অর্ধমাত্রা, কোন বর্ণ মাত্রাহীন, তা শুরু থেকেই পাঠ্যবইয়ের সাহায্যে তাদের শেখাতে হবে এবং বোঝাতে হবে। শিশু একেবারেই ছাপার অক্ষরের মতো লিখতে পারবে না। তবে অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে সঠিকভাবে লেখার অভ্যাসে নিয়ে যেতে হবে।

বলা শেখা - এবার আসা যাক শিশুদের কথা বলার অভ্যাস বা দক্ষতা অর্জনের বিষয়ে। কথা বলার অভ্যাস শেখাতে গেলে প্রথম বোঝা দরকার যে, শিশুটি যে বিষয়টি বলতে চাইছে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা আছে কিনা। শিশু যদি সামনে একটা নদী দেখে তবে তাকে খুঁটিয়ে নদী দেখাতে হবে বা নদীর গল্প শোনাতে হবে যাতে সেখান থেকে তার স্পষ্ট ধারণা তৈরি হতে পারে। তখন সে প্রাপ্ত ধারণা থেকে তার ধারণা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু ঘটনা যদি হয় উল্টো অর্থাৎ ধারণায় যদি তার অস্পষ্টতা থাকে তবে বলতে গিয়ে তোতলাবে, কথা আঁটকে যাবে। এছাড়াও শিশুকে শেখানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই স্থান, কাল, পাত্র, ব্যক্তি বিশেষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হয়, সেগুলো শেখাতে হবে। সম্বোধন কীভাবে করবে, জোরে কখন কথা বলবে, আস্তে কোথায় কথা বলতে হয়, কোথায় মান্য বাংলা বলবে আর কোথায় চলিত বাংলা বলবে বা স্থানীয় ভাষায় কথা বলবে এগুলি তাকে শেখাতে হবে।

এই প্রক্রিয়া পদ্ধতিগুলি ক্রমান্বয়ে শিশুকে শেখাতে থাকলে পড়া, লেখা এবং বলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই শিশু দক্ষতার প্রমাণ দিতে পারবে।

শেষ করি কবিগুরুর কথা দিয়েই, তিনি বলছে, "শুঁটির মধ্যে যে বীজ লালিত হইয়াছে ক্ষেতের মধ্যে সেই বীজের বর্ধিত হওয়া চাই"। খেত হলো পরিবার, সমাজ, শিক্ষক সকলে মিলে আমরা। আমাদের দায়িত্ব এড়িয়ে শিশুদের দক্ষতা খুঁজতে যাওয়া ভুল।

মেচবাহার সেখ
বিশিষ্ট লেখক, সাবেক পরামর্শদাতা,
ইউনিসেফ ও সাবেক রাজ্য পরামর্শদাতা, সর্বশিক্ষা মিশন

ভাষাশেখা

অমিত দে

সচেতন অবশ্যই থাকতে হবে উচ্চারণ, বানান ও ব্যাকরণে। তবে দেখতে হবে ব্যাকরণ জ্ঞান যেন কোনোভাবেই ভাষার প্রাসাদগুনকে আক্রান্ত না করে, কল্পনাশক্তির প্রকাশকে ব্যাহত না করে।

"শহুরে ফ্ল্যাটে বাস
ভাবনা বার মাস।"

এইতো, গত পরশু দিন, - সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার সময় বেসমেন্টে বাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ-কারীর বছর চারেকের শিশুপুত্রটি যে ভাবনায় আমাকে একেবারে নিমজ্জিত করে দিল, তা একান্তই অভাবনীয়।

সে একটা থামের আলো আঁধারী থেকে বলে উঠল, "কাকু, কাকু, (প্রসঙ্গত বলে রাখি, ওর বাবারও আমি "কাকু")" এই দ্যাখ,আমি বিড়ি টানছি। "ভঙ্গীটি নিখুঁত। আমি থতমত ভাবটা কাটিয়ে ওর প্রতি যথাকর্তব্য পালন করে (না, বকাবকি, অবশ্যই নয়, "বিড়ি"টিও এক মোড়ানো কাগজ) চমকালাম এই ভেবে যে, এই তো আমার সামনেই মহামতি ভাষাভাবক চমস্কি কথিত Language Acquisition Device, (সংক্ষেপে LAD)-এর প্রজ্বলন্ত নিদর্শন দেখা গেল।

প্রথমত বাক্যটি ব্যাকরণগতভাবে নির্ভুল। দ্বিতীয়ত ওর বাক্যে ব্যবহৃত ক্রিয়া পদটি একটু লক্ষ্য করা যাক। আমরা বাঙালিরা জল খাই, বকুনি খাই, ইস্কুলে চড় খাই, সিগারেট-বিড়িও খাই আবার, ক্ষেত্রবিশেষে ফুঁকি বা টানি। ওর ব্যবহৃত "টানছি" ক্রিয়া পদটি যেমন শিশুর অনুকরণ প্রবৃত্তিকে প্রকাশ করে, ঠিক সে ভাবেই বুঝিয়ে দেয় ওর সামাজিক অবস্থান। ওর বাবা বা অন্য কোনো আপনজন হয়তো বিড়ি" টানেন" এবং অনায়াসে সে ওই দুটি বিশেষ্য ও ক্রিয়া পদকে সংযুক্ত করেছে। "কাকু"কে যে 'দ্যাখ' বলাটা সমীচীন নয়, সে সামাজিক বোধ ওর জাগেনি। ভাষাতো সামাজিক এক যোগসূত্র বটেই, একই সঙ্গে তা কী বেড়ে ওঠার আবহনির্ভরও নয়?

অধ্যাপক চমস্কি কথিত ওই LAD ব্যাপারটি একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। উনি বলছেন যে প্রত্যেক শিশু তার জানা সসীম শব্দ দিয়ে অসীম বাক্য রচনা করতে পারে। শৈশবে এই প্রক্রিয়া শুরু হয় আর সময়ের সঙ্গে তা ব্যাপকতর হতে থাকে। এই ভাবে প্রত্যেক ভাষার নিজস্ব এক প্রকাশ শৈলী গড়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে আবার প্রয়োজনে ফেরা যাবে। এখন ওই শিশুটির গহীন সারল্য থেকে উচ্চারিত বাক্যটিকে একটু তলিয়ে দেখা যাক।

ঠিক এই ভাবেই আমাদের চারপাশে সব শিশুই ব্যাকরণ না জেনে শুদ্ধবাক্য অনর্গল বলে চলে। আমি অবশ্য সেই শিশুদের কথাই বলছি যারা একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক ধ্বনি উচ্চারণের চৌকাঠ পেরিয়ে শব্দ উচ্চারণে সক্ষম হওয়ার বয়সে পৌঁছেছে। তারা কিন্তু নিজেরা ব্যাকরণ না জেনেই ব্যাকরণ জ্ঞানের উদ্দেশ্য সফল করে চলেছে। এরপর ধাপে ধাপে তার সামাজিকীকরণ ঘটতে থাকবে এবং সে স্থান কাল পাত্র ভেদে শব্দ চয়নে স্বশিক্ষিত হয়ে উঠবে। তাহলে এই স্তরে তার ওপরে ব্যাকরণ শেখার বোঝা না চাপানোই ভালো মনে হয়।

তবে এই স্তরে আমাদের ভালো লাগে বলে আধো আধো উচ্চারণ কে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো, কারণ অশুদ্ধ উচ্চারণ পরবর্তী কালে বানান ভুলের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাংলায় অবশ্য তিন " স", দুই "ন" মিলে ভারী বিভ্রাটে ফেলে, সে ক্ষেত্রে প্রচলিত ও গ্রাহ্য উচ্চারণকে

মান্যতা দিতে হবে। হিন্দিতে এই সমস্যা নেই বললেই হয়। বস্তুত ভাষার অধিকার মানুষ পাওয়ার অনেক পরেই তো বৈয়াকরণরা ভাষার নিহিত নিয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছেন এবং যেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে, সেটি হয়ে দাঁড়িয়েছে নিপাতনে সিদ্ধ।

ভাষা সদা বহমান, তার চলনস্রোতে নানা দেশি বিদেশি শব্দের লেনদেন চলতে থাকে,সময়ান্তরে শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটতে থাকে এবং তা ঘটে ব্যাকরণ না মেনেই। "অপব্যবহার" বা "অপভাষা" শব্দে "অপ" অর্থ নিকৃষ্ট, কিন্তু "অপরূপ" শব্দটিতেও কি তাই? এইসব "ভজঘট" ক'দিন না হয় তোলা থাক। ব্যাকরণ আমাদের শিখতেই হবে সন্দেহ নেই। মন দিয়ে শিখব কিন্তু যথাসময়ে, অর্থাৎ যখন তা শুধু সূত্র মুখস্থের বোঝা হবেনা, বরং আমার ভাষাকে ভালোবেসে জানার আনন্দ ছড়াবে। ধরে নিচ্ছি সেটা দশ-বার বছর বয়সে। তার আগে ছোটো নদী আঁকে বাঁকে চলতে থাক,হাবুদের ডাল কুকুর তাড়া করুক, হেড অফিসের বড় বাবুর গোঁফ চুরি যাক, শকুন্তলার কষ্টে চোখে জল আসুক। তারপর এইসব যাদুকাঠির ছোঁয়ায় আমার ভাষাটিও কখন যে "অপরূপ" হওয়ার পথে অজান্তেই পা বাড়িয়েছে বুঝতেও পারব না।

আর এই সব খুশির পড়ার মধ্যে তাজা মন ক্রমাগত অসংখ্য বানানের ছবি কখন যেন ঠিক তুলে নিয়েছে। লিখতে গিয়ে দ্বিধা হলে ওই ছবিই বলবে, "আমাকে মনে মনে দ্যাখ।" ওদিকে বানান শেখাও চলতে থাকবে।

ইস্কুল যাওয়া এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে, সামাজিকীকরণ চলছে, বাড়ির ভূমিকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া পারিবারিক আবহে সংবেদনশীলতা, বন্ধন, নৈতিকতা, ভালোবাসা -এই সব দিয়ে ঘিরে রাখতে হবে তাকে। এ ধরনের হৃদয়সম্পদ যে ভাষাকে প্রভাবিত করে সে কথা সজাগ থাকলেই বোঝা যায়। ভাষার যে এক মনস্তাত্ত্বিক দিক আছে সে কথা অনস্বীকার্য।

এবার ব্যাকরণ শেখার পালা। এই পর্বে প্রবেশের আগে দু একটি কথা বলার আছে। প্রথমত এ কথা আমরা দেখেছি যে বাংলা ব্যাকরণ বিশ্লেষণাত্মক। তাই এখানে প্রবিষ্ট হওয়ার আগে ভাষা বোধের ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা দক্ষতা অর্জন করে নেওয়া ভালো। আর শেখানোর ক্ষেত্রে উদাহরণ থেকে সংজ্ঞায় গেলে (functional grammar) ছোটদের বুঝতে সুবিধা হয় বলেই আমার মনে হয়।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যা পেশ করতে চাই, সেটি এই যে, আমাদের বৃহত্তর শিক্ষার্থী সমাজ ছড়িয়ে আছে গ্রামে। তারা বাড়িতে বা পরিবেশে তাদের অঞ্চলে প্রচলিত বাংলা শুনে বড় হয়। এদিকে পাঠ্য ব্যাকরণ রচিত হয় মান্য বা প্রমিত ভাষায়, আঞ্চলিক ভাষায় নয়।

এই প্রমিত ভাষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। যখন শহর গড়ে ওঠে, জীবিকার তাগিদে নানা অঞ্চল থেকে মানুষ সেখানে চলে আসেন, তখন বিদ্যাশিক্ষা বা কাজ কর্মের জন্য একটি সর্বজনমান্য ভাষারূপ জরুরি হয়ে পড়ে। রকমারি ভাষায় এ কাজ চলে না। তখন ঐ সব আঞ্চলিক ভাষার সম্প্রেষণে তৈরি হয় প্রমিত ভাষা, নাগরিক জীবনের ভাষা। ব্যাকরণ সেই ভাষার জন্যই তৈরি হয়। তাই শিক্ষার্থীদের সে ভাষায় অভ্যস্ত হওয়ার পরে ব্যাকরণ শুরু করা বোধহয় শ্রেয়।

এইবার প্রশ্ন হল বানান ও ব্যাকরণ শিক্ষা। লেখার ক্ষেত্রে তা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এর আরেকটি দিক আছে। ব্যাকরণ সম্পদে ধনী প্রমিত ভাষা কখন যেন আঞ্চলিক ভাষাকে অজান্তেই হেয় জ্ঞান করতে থাকে। এটি একান্তই অবাঞ্ছিত। আঞ্চলিক

ভাষাতেও অনেক অতুলনীয় সাহিত্য রচিত হয়েছে। এই মনোভাব যেন না জাগে, সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

এই সুযোগে একটা ইতিহাসের গল্প আমরা মনে করে নিই। পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক। স্পেনের রানী তখন ইসাবেলা। একদিন দরবারে বসে তিনি আর কলম্বাস মনোযোগ দিয়ে কলম্বাসের আসন্ন সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে কথা বলছেন, এমন সময়ে সেখানে এসে হাজির হলেন সে সময়ের এক বিখ্যাত স্পেনীয় পন্ডিত নেব্রিহা (ইংরাজি বানানে Nebrija, তাঁর নামে স্পেনে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে)। সঙ্গে তার অনেক কাগজপত্র।

তিনি রানীর সাক্ষাৎ প্রার্থী। রানী বললেন তিনি ব্যস্ত, পরে আসতে। কিন্তু পন্ডিতমশাই নাছোড়। বললেন তাঁর কাজটি অতি জরুরি। সময় দিতে হল। নেব্রিহা হাতের ওই কাগজপত্র এগিয়ে দিয়ে বললেন এগুলি এখনই মুদ্রণের জন্য জার্মানিতে পাঠাতে হবে, হাজার খানেক কপি চাই। এ ঘটনার কয়েক দশক আগেই গুটেনবার্গ প্রেস আবিষ্কার করেছেন। রানী জানতে চাইলেন কী ছাপাতে চান তিনি । বললেন স্পেনীয় ভাষার ব্যাকরণ। রানী বললেন, "কী হবে ছেপে?" নেব্রিহা বললেন,"তোমার হাতের সবচেয়ে ধারালো তলোয়ার হবে। শহুরে ওপরতলার লোকেরা এটা শিখবে। নিচুতলার মানুষজন প্রান্তিক হয়ে যাবে।

এই উন্নাসিকতা অবাঞ্ছিত। তা ছাড়া দেখতে হবে ব্যাকরণ জ্ঞান যেন কোনো ভাবেই ভাষার প্রসাদ গুণকে আক্রান্ত না করে, কল্পনাশক্তির প্রকাশকে ব্যাহত না করে, এদিকে আবার ব্যাকরণকেও মান্যতা দিতে হবে। এর জন্য অবশ্যই পাঠ্যসূচির বাইরে ভালো বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে।

যে কোনো ভাষার শব্দসম্ভারের একটা সীমা থাকে এবং জাতির উন্নতির স্তরের ভিন্নতার ওপরে নির্ভর করে সেই ভাষার অন্তর্গত শব্দসংখ্যার তারতম্য। কিন্তু মানুষের অনুভবের তীব্রতা, গভীরতা, সুক্ষ্মতা বা জটিলতার বৈচিত্র্যকে পূর্ণত প্রকাশের পক্ষে তা অপ্রতুল।

সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ভাষার কিছু অনুকরণীয় ব্যবহার বৈচিত্র্য থাকে। ছটফটে শিশুকে মা যখন বলেন,"তোর পায়ে কি কাক বাঁধা আছে?' "তখন ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থপ্রসারণশীলতার নিদর্শন দেখে বিস্ময় লাগে।

এখন ওই যে শিশুটি, যার প্রসঙ্গ দিয়ে এই "বাক্যি চচ্চরি"(এ শব্দবন্ধ বিবেকানন্দ স্বয়ং তাঁর "বাংলা ভাষা" প্রবন্ধে ব্যবহার করেছেন) পাকানো শুরু হয়েছিল, তার শব্দ ভাঁড়ার যদি ক্রমশ না বেড়ে চলে, তা হলে ক্ষুধা, তৃষ্ণার মতো সাধারণ চাহিদার কথা সে বলতে পারবে বটে, কিন্তু কখনোই তার আবেগ-অনুভব বা সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটাতে পারবে না। অর্থাৎ তাকে আজীবন ভাষার বৃহত্তর দিগন্তের দিকে চলতে হবে। ভাষাই চিন্তার বাহন, ভাষাহীনতার অর্থ চিন্তায় অক্ষমতা। আর কে না জানেন "আমি চিন্তাসক্ষম, তাই আমি অস্তিত্ববান।"এজন্য পাঠাভ্যাস জরুরি।

বাকি রইল লেখা। সেখানে দুটি দিকে নজর রাখা দরকার। প্রথমত যা বলতে চাই, তার তীক্ষ্ণ প্রকাশের জন্য যথাযথ শব্দ নির্বাচন। এ দক্ষতা অভ্যাসে বাড়ে। আর বানান। বাংলা বানান সর্বদা উচ্চারণ অনুযায়ী হয় না, (অর্থাৎ ফোনেটিক্যাল নয়)। তা ছাড়া বানানের সামান্য হেরফেরে অনেক ক্ষেত্রে শব্দার্থ বদলে যায়। সুতরাং সাধু সাবধান। বানান আয়ত্ত্ব করতে হবে। আর তার জন্য ব্যাকরণ শিখতে হবে। তা ছাড়া আধুনিক কাল সহজ প্রকাশভঙ্গির দাবীদার। সেখানে "বাহাদুর সমাস বা প্যাঁচালো বিশেষণ" ব্যবহার অবাঞ্ছিত।

এ শেখা সাধনা নির্ভর। মাতৃভাষা এ সাধনা দাবী করে। এ যে "মোদের গরব, মোদের আশা।"

অমিত দে
বিশিষ্ট লেখক ও অবসরপ্রাপ্ত ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক

ভূগোল আমার পছন্দের, তোমারও

অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'ঝড়কে পেলেম সাথী'। এই যে নিমগ্নতা প্রাকৃতিক উপাদানদের ঘিরে দার্শনিকতা, এটা এসেছিল তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা হবার সুবাদে। এটাই তো ভূগোল পাঠের মূল মন্ত্র।

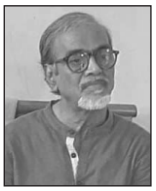

একদম ছোট বেলায় পৃথিবীর অনবরত ঘুরপাক খাওয়াকে ঘিরে ও তার পাহাড়, জঙ্গল, নদীদেরকে নিয়ে আমার ছিল নানান প্রশ্ন। যা সামাল দিতেন বাড়ির বড়রা। আমার বড়দা সেইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন খুব যত্ন সহকারে, সঙ্গে জুড়ে দিতেন পৃথিবীকে নিয়ে নানান দেশী-বিদেশী গল্প। যেমন 'এরাউন্ড দা ওয়ার্ল্ড ইন এইট্টি ডেস্', 'জার্নী টু দ্য সেন্টার অফ্ দ্যা আর্থ', 'চাঁদের পাহাড়' আরো কত বিচিত্র বিচিত্র ঘটনা পৃথিবীকে নিয়ে। কল্পনার জগৎ এঁকে দিতেন আমার ডাগর চোখে, এক কথায় আমাকে চিনতে শিখিয়েছিলেন পৃথিবীকে একটু অন্য ভাবে। আজ বুঝি সেটা।

একটু বড় হতেই আমার পড়বার টেবিলে একদিন বড়দা একটা মস্ত গ্লোব এনে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এই নাও তোমার সব থেকে প্রিয় জিনিষটা।

সত্যি বলতে কি, সেদিন থেকেই অন্যান্য পাঠ্যসূচির বিষয়রা আমার ভালবাসার তালিকায় নিচে চলে গিয়েছিল। পৃথিবীকে ঘিরে আমার জ্ঞানচর্চার বারান্দায় ভূগোল বিষয়ের ওপর এক অদ্ভুত অনুভূতির জায়গা তৈরি হয়ে গিয়েছে। এক কথায় ভূগোল বিষয়ের প্রেমে পড়ে গিয়েছি সেই ক্লাস থ্রী-ফোর থেকেই। তারপর, যতই জেনেছি পৃথিবীকে ভূগোলের হাত ধ'রে, ততই আমার বুদ্ধিমত্তার ময়দানটা শুধুই বড় হয়ে চলেছে, আজও চলছে।

পরবর্তীকালে অন্যান্য বিষয়দের সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলা, পাঠক্রমের বেড়াজালের নিয়মানুসারে সফল ছাত্র হিসেবে। তবে আজ স্বীকার করি আপন মনে যে, ভূগোলের প্রতি আমার গভীর ভালবাসাই আজ আমাকে ভারতবর্ষের এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়েছে। আসলে ভূগোল বিষয়ের প্রতিটা অধ্যায়ের প্রতি আমার তৈরি হয়ে আছে এক নিখাদ প্রেমের বাসভূমি।

ছাত্র জীবনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর (পোস্ট গ্রাজুয়েশন)-এর ক্লাস শুরুর আগে মাস-খানেক উপরি সময় হাতে চলে এসেছিল। বড়দার কথামতো কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে পিঠে হ্যাভার স্যাক্ ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলাম গ্রামীণ ভারতকে দেখতে। বড়দা বলতেন, ভূগোল বিষয়কে ভালো ক'রে বুঝতে হ'লে পায়ে হেঁটে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে ঘুরতে হবে, এক বিশ্লেষণী চোখ নিয়ে দেখতে হবে সবকিছু। দেখবে পাহাড়-পর্বত, জল-জঙ্গল, মানুষের জীবন-জীবিকা, আঞ্চলিক সংস্কৃতি – সবকিছুর মধ্যে একটা লুকিয়ে থাকা সম্পর্ক আছে। যে সম্পর্কের জীয়ন কাঠি হ'ল স্থানীয় ভৌগোলিক পরিবেশ। অনুভব করবে ভূগোল বই-এর প্রতিটা পাতার লেখারা আর ছবিরা আমাদের চারপাশে যেন উদাহরণ হিসেবে ছড়িয়ে আছে। একটু অনুধাবন করতে পারলেই বোঝা যায় যে পৃথিবীতে সবকিছুর সৃষ্টি বা বিনষ্টের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক লেগে আছে। আর সেটাই হ'ল ভূগোল বিষয়ের প্রাণবায়ু।

ছাত্র জীবনে যে উৎসাহের ঢেউ লেগেছিল শরীরে আর মনে, আজ সেই ঢেউ উত্তাল হয়ে সঠিক ভূগোলবিদ প্রমাণ করতে আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের চারটি নদী ও ইংল্যাণ্ডের একটি নদীর উৎস থেকে মোহনা পরিভ্রমণ করেছি সমীক্ষার কারণে। পরিভ্রমণের সময় বুঝেছিলাম যে এই সব নদীরা ও তার আশপাশ অঞ্চল এক-একটা আস্ত ভূগোলের ক্লাস রুম। বুঝেছিলাম প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন গাথা একেবারে কাঁথা সেলাই-এর মতো হয়ে আছে। নদী পাড়ের মানুষদের জীবন-জীবিকা, সংস্কৃতি, সভ্যতা সবকিছু নদীর

নড়াচড়া, নদীর খামখেয়ালিপনা বা সুস্থির চরিত্রের ওপর আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। এই ধারণাকে আরো জোড়ালো করতে আমি কোপাই নদীর উৎস থেকে মোহনা দু'বার পরিভ্রমণ করি পায়ে হেঁটে পঁচিশ বছরের ব্যবধানে (১৯৯১ সালের ডিসেম্বর ও ২০১৭ সালের জানুটারী)। নদী পাড়ের জনজীবনে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল সেই পঁচিশ বছরের সময়ের হাত ধ'রে। সেও এক সচল ভূগোলের অধ্যায়। স্বচক্ষে দেখেছিলাম সময়কে সঙ্গে নিয়ে ভূগোলের উঠোনে জীবন রঙের আলপনার পরিবর্তন। সে হ'ল পরিবর্তিত ভূগোল।

বিগত অধ্যাপনা জীবনে নির্দ্ধারিত পাঠক্রম সূচির মধ্যে থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিটি ক্লাসে বলতাম, যে অধ্যায়টি পড়বে, তাকে অনুধাবন করার চেষ্টা ক'রো। সেই অধ্যায়ে নিজেকে ভাসিয়ে দাও। নিজেকে সেখানে নিয়ে যাও। একজন সঙ্গী হয়ে যাও সেই অধ্যায়ের বিষয়টির সঙ্গে। বন্যা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, ঝড় – এদেরকে শুধুমাত্র বিপর্যয়ের হেতু বলে ভাববার আগে ভেবে নাও এইসব অতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে স্বাভাবিক নিয়মে, এক অমোঘ নিয়মে। পৃথিবী তৈরির কর্মশালায় এগুলি এক-একটি পর্যায়ের ঘটনা, অতি প্রাকৃতিক ঘটনা। এদের সদর্থক ভাবে গ্রহণ করতে শিখতে হবে। সেটি হবে ভূগোল পাঠের আরেক দিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঝড়কে দেখে বলেছিলেন, 'ঝড়কে পেলেম সাথী'। এই যে নিমগ্নতা প্রাকৃতিক উপাদানদের ঘিরে সঠিক দার্শনিকতা, এটি এসেছিল ওনার প্রকৃতির নানান উপাদানের সঙ্গে একাত্মতা হবার জন্য। যা ভূগোল পাঠের মূলমন্ত্র। তাই, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার কাছে শুধুমাত্র কবি, প্রাবন্ধিক, গল্পকার, সঙ্গীত স্রষ্ঠা নন। তিনি একজন যথার্থ অর্থে পরিবেশবিদ্ ও ভূগোলবিদ্।

আমি টোপোসীট (Topographical Sheet / Map) সেখানোর ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের বলতাম, তোমরা মানচিত্রটাকে ভালো করে অনেকক্ষণ দ্যাখো। সবকিছু ভুলে গিয়ে কল্পনাতে ঐ মানচিত্রের কোনো একটা গ্রামে নিজেকে নিয়ে যাও। রাস্তা-ঘাট, গাছপালা পাহাড় নদীদের মন ডুবিয়ে দ্যাখো। যখন দেখবে ঐ মানচিত্রের গাছপালারা হাওয়াতে দুলছে বা রাস্তা দিয়ে কোনো একজন গরু গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছেন ধুলো উড়িয়ে, তখন বুঝবে যে তোমার ঐ মানচিত্রকে বিশ্লেষণ করার অধিকার এসেছে। আসলে আমরা ভূগোল বিষয়ের বিভিন্ন অধ্যায়কে গভীরভাবে জানতে চাই না, দায় সারা দায়িত্বের মধ্যে ফেলে রাখি। তাই মনে হয় ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতার মান বৃদ্ধি পায় শুধুমাত্র কাগজে আর ছাপা অক্ষরের মানপত্রে। আদপে অনেকেই ভূগোল বিষয়ের বাইরে হুটোপুটি করেন কিন্তু ভূগোলকে জীবনের সঙ্গী হিসেবে পান না।

দীর্ঘ পঁয়তিরিশ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর হয়তো এক অলিখিত অধিকার এসেছে, সেখান থেকে বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে অনুরোধ রাখতেই পারি যে, সংখ্যাতত্ত্বের সমীক্ষার বাইরেও অনেক কিছু না-বলা কথা থেকে যায়। সেইসব না-বলা কথাদের অনুভূতির স্তর দিয়ে ভরাট করতে পারলেই ভূগোল বিষয়ের মূল সুরটাকে ধরা যায়। সমীক্ষার তথ্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যন্ত জঙ্গলের অধিবাসীদের দরিদ্র বলবার আগে সমীক্ষককে খুঁজে পেতে হবে কোন কোন দৃষ্টিভঙ্গীতে সেই সম্প্রদায়ের সকলকে ধনী বলে বিবেচিত করা যাবে। কারণ এতোদিন ধ'রে ঐ সম্প্রদায়ের মানুষজনের প্রত্যন্ত জঙ্গলে টিকে থাকবার অনেক সজীব কারণ থাকে। সেগুলোই হ'ল আসল ভূগোল চর্চার ক্ষেত্র। জানি না হয়তো এমন সময়ও আসবে, যখন উপগ্রহ চিত্র থেকে মানুষের অনুভূতির স্তরও নানান রঙের মাত্রা দিয়ে ধরা হবে। আর প্রত্যন্ত জঙ্গলের বা বোবা মরুভূমির অধিবাসীদের গাঢ় রঙের হেরফেরে পিছিয়ে পড়ার পর্যায়ক্রমে আনা হবে।

ইদানীং প্রযুক্তির বৈঠকখানায় নদী-পাহাড়-জঙ্গলের চরিত্ররা সংখ্যা ঘরে ধরা পড়ছে প্রতিনিয়ত এবং বিশ্লেষণে সংখ্যার গুদাম ঘর তৈরি হচ্ছে। কিন্তু নদী আসলে কি বলতে চায়, পাহাড়ের অভিমান কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে, জঙ্গলের কিনারার গাছপালা কতটা ভীত ও সন্ত্রস্ত? তার হিসেব কোথায়? সে হিসেব আছে ভূগোল পাঠের অনুভূতির বাসর ঘরে। ভূগোল পাঠের নিজস্ব পাঠশালায়। যে তার হদিশ পায়, সে ভূগোলকে তার জীবন সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যায়। সেটাই তো আসল পাওয়া জ্ঞানচর্চার দালান বাড়িতে।

অধ্যাপক মলয় মুখোপাধ্যায়
বিশিষ্ট লেখক, নদী বিশেষজ্ঞ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক,
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

সেভেনের ছাত্রীদের সঙ্গে আধ ঘন্টা অঙ্কের ক্লাস

দেবব্রত মজুমদার

বললাম–৬২টা বিস্কুট আছে, ৬ জনকে সমান ভাবে ভাগ করে দিলে প্রত্যেকে কটা করে পাবে এবং বাড়তি কটা বিস্কুট তোমার হাতে থাকবে? খাতায় করে দেখাও তো।

ক্লাসে ঢুকতেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেয়েরা শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। আমি হেসে হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে বসতে বললাম। মুখেও বললাম, বসো, বসো। বসল সবাই। কিন্তু অঙ্কের ক্লাস শুনে কয়েকজন একেবারে বেঁকে বসল। জনা ৩০-৩৫ ছাত্রী। আমি বললাম, অঙ্ককে ভয় পাও? দ্বিধহীন উত্তর, হ্যা স্যার! আমি আবার হাসতে হাসতে বললাম, দেখ, আধ ঘন্টায় ঐ ভয় একেবারে শিকড় সমেত তুলে দেব। মেয়েরা অবিশ্বাসের হাসি হাসল। তবু আমি বললাম, এই তো চাই্। হাসি দেখতে চাই শুধু! ওরা আবার হাসতে লাগল। এবার বললাম, হাসতে হাসতে খাতা বের করে ফেল। শুধু একটা ছোট্ট ভাগ কর। বোর্ডে লিখলাম, $62 \div 6$। জানতে চাইলাম, কেউ কি বোর্ডে অঙ্ক কষতে ভালোবাস? কেউ "হ্যাঁ" বলল না। তবে খুব সহজ অঙ্ক দেখে একে একে মেয়েরা খাতা বের করতে লাগল। খাতায় লিখতেও শুরু করল। আমি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। একজন দশমিক দিয়েছে দেখে বললাম, শুধু পূর্ণ সংখ্যায় ভাগফল আর ভাগশেষ লেখ। দশমিক দিয়ে কিছু করতে হবে না। নানা রকম লেখা:

প্রথম দল: ৫-৭ জন

```
6) 6 2 (1.33..
   6
   --
    20
    18
    --
     20
     18
     --
      2
```

দ্বিতীয় দল: ১০-২০জন

```
6) 6 2 (1
   6
   --
     2
```

তৃতীয় দল: ১ জন

```
6) 6 2 (10
   6
   --
     2
```

চতুর্থ দল: ১-২ জন

```
      1
6 | 6 2
  | 6
  -----
      2
```

[চিত্র- 1]

জানতে চাইলাম, ভাগফল কত আর ভাগশেষ কত? সমস্বরে উত্তর এলো, ভাগফল এক আর ভাগশেষ দুই। যে ভাগফল 10 আর ভাগশেষ 2 লিখেছে, সে তো একা! কথায় বলে "একা হলে বোকা"। তাই সে ভয়ে ভয়ে নিরুত্তর। তার খাতাটা নিয়ে বললাম, এক এর পর শূন্যটা কী করে হল? তাতেও সে নিরুত্তর।

এবার সবার জন্য বললাম, এই অঙ্কটা ভাষায় বলি? ঘাড় নাড়ল অনেকেই। এরই মধ্যে দুজন ছাড়া সবাই মন দিয়ে শুনছে, বলছে, ঘাড় নাড়াচ্ছে। নব্বই শতাংশের বেশি অংশগ্রহণ। বেশ আনন্দ হল।

বাকি দুজন একটা বই নিয়ে টানাটানি, হাসাহাসি করছে। হাসতে হাসতে তাদের উদ্দেশ্যে বললাম, তোমরা যে হাসাহাসি করছ, এটাই ভালো। কান্নাকাটি, মুখভার করে থাকা একদম ভালো নয়! শুনে সবাই খুব হাসল।

এবার অঙ্কে ফিরে এলাম। ভাষায় অঙ্কটা এমন হতে পারে: তোমার কাছে 62 টা বিস্কুট আছে। তুমি 6 জনকে সমানভাবে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছ। এক এক জন কটা পাবে আর কটা তোমার কাছে থেকে যাবে? সমস্বরে (প্রায়) সবাই আকারে ইঙ্গিতে বা মুখের ভাষায় মেনে নিল যে এটা সঠিক একটা ভাষারূপ।

আমি বললাম, তোমরা বলছ, ভাগফল এক। মানে প্রত্যকে একটা করে পাবে।

তাতেও সবাই সম্মতি দিল। সামনের দুটো বেঞ্চে ছ'জন ছিল। আমি তখন বললাম, বেশ এদের ছ'জনকে একটা করে বিস্কুট দিলাম। তাহলে আমার কাছে কটা থাকবে? অনেকেই বলল, দুটো। আমি যেন বাঁহাতে 62 টা বিস্কুটের প্যাকেটধরে রেখে 6 টা বিস্কুট দিয়েছি এমন ভঙ্গি করে বললাম, হাতে আর মোটে দুটো থাকবে? এবার একজন বলল, না স্যার, 56 টা থাকবে। চোখটা সবার দিকে একবার ঘোরাতে থাকলাম। আরও চার-পাঁচ জন বলল, না স্যার, 56 টা থাকবে। আমি বললাম আর একটা করে দিলে কটা থাকবে হাতে? এবার অনেকে বলল, 50 টা।

এবার আমি বোর্ডে লিখলাম:

```
 62        56
- 6       - 6
---       ---
 56        50
```

[চিত্র-2]

মুখে বললাম, একটা করে দিলে থাকে ছাপান্নটা। আর একটা, মানে মোট দুটো, করে দিলে থাকে পঞ্চাশটা। এভাবে কতক্ষণ বিয়োগ করবব? একটু থেমে, কেউ কিছু বলছে না দেখে বললাম, যতক্ষণ না বিয়োগফল 6 এর চেয়ে ছোট হচ্ছে!

একজন (সম্ভবত সেই "একা-বোকা", ভাগফল 10 লেখা মেয়েটা) ভাবছিল এই কথাটা। শুনেই উজ্জ্বল হল তার মুখটা। আর একবার বোঝাতেই দেখি বেশিরভাগেরই মুখে হাসি, ইঙ্গিতে সম্মতির ঘাড় নাড়া।

এবার আবার ফিরলাম ভাগ করায়। লিখলাম

```
6) 6 2 (10        6| 6 2
```

[চিত্র-3]

চিত্র-3 এর প্রথম অংশটা দেখিয়ে বললাম, ভাগ করার জন্য তোমরা অধিকাংশই সংখ্যাগুলো এভাবে লিখেছ। কয়েকজন অন্যভাবে লিখেছ। এর মধ্যে কীভাবে লেখা ভাল? অধিকাংশই বলল, দুটোই লেখা যায়। কোনো ভালোমন্দ নেই। যারা শেষেরটা লিখেছিল তাদের একজন বলল, আগে আগে প্রথমটা লেখা হত। এখন পরেরটা লেখা হয়। কিন্তু কেন তা জানিনা!

আমি আবার ভাগে ফিরে গেলাম। লিখলাম

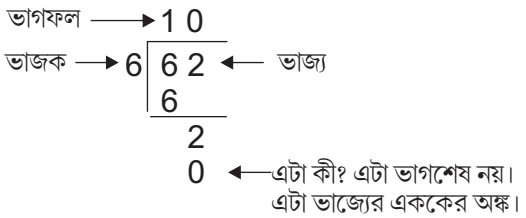

[চিত্র-4]

বললাম, ভাগের শুরুতে 6 দিয়ে কতকে ভাগ করছি? কেউ কেউ বলল, 6 কে। আমি একটু অসম্মতি প্রকাশ করায় একজন বলল, না, 6 দশকে ভাগ করছি।

আমি বললাম, ঠিক বলেছ। তাই ভাগফল 1 (দশ) লিখতে হবে ঠিক 6 (দশ) এর উপরে। এই 1, ভাগফলের দশকের অঙ্ক। ভাজ্যের দশকের অঙ্ককে ভাগ করে ভাগফলের দশকের অঙ্ক পেলাম। তেমনি ভাজ্যের এককের অঙ্ককে ভাগ করে পাব ভাগফলের এককের অঙ্ক। ভাজ্যের এককের অঙ্ক 2। তাকে 6 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় 0। সেটা ঠিক ভাজ্যের এককের অঙ্কের উপরে বসালাম। এবার যেটা পড়ে রইল সেটা ভাগশেষ। আর ভাগফল হল 10। যে 10 উত্তর লিখেছিল কিন্তু জানত না কেন শূন্যটা দিল, এবার জানল, উজ্জ্বল হাসিতে তার মুখ হল আলো। বাকিদের অধিকাংশই সম্ভবত বুঝতে পারল।

আমি বললাম) (চিহ্ন দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলে প্রথমে যে 1 লিখেছ, সেটা কোন স্থানের অঙ্ক তা কী বোঝা যেত? অনেকে বলল, না স্যার। জানতে চাইলাম, কীভাবে ভাগ শুরু করবে বুঝলে তো?

আমি বললাম, এবার সামান্য বদলে দিই অঙ্কটা: $626 \div 6$। ভাগফল কত আর ভাগশেষ কত?

এবার অনেকেই 100 ভাগফল পেল। 2 ভাগশেষ

পেল। কয়েকজন সবই ঠিকঠাক (নীচে যেমন দেখাচ্ছি ঠিক তেমনি) লিখল। কয়েকজন 2 দশকে ভাগ করার ধাপটা দেখাল না।

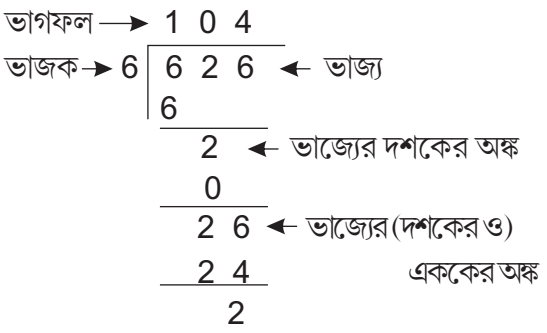

[চিত্র- 5]

অঙ্কটার একটা ভাষারূপের কথা বললাম: 6 টা একশ' টাকার নোট, 2 টা দশ টাকার নোট আর 6 টা এক টাকার নোট মিলিয়ে মোট 626 টাকা 6 জনের মধ্যে ভাগ করে দিতে হবে।

একশ' টাকার 6 টা নোট 6 জনকে দেওয়া তো সহজ। কিন্তু দশ টাকার নোট 2 টা ভাগ করতে গেলে প্রতিজনকে 0 টা দেওয়া যাবে। তাহলে দশকের ভাগফলের স্থানে হবে 0 । তারপর 2 টা দশ টাকার নোট পড়ে থাকবে। সে দুটো "ভাঙিয়ে" নিতে হবে 2 দশটা এক টাকায়। তারপর মোট 2 দশ 6 টা এক টাকার নোট চার জনের মধ্যে ভাগ করলে প্রতিজন পাবে 4টা। পড়ে থাকবে 2টা।

ভাগফলের কোন স্থানে কোন সংখ্যা বসছে সেটা মেয়েরা বেশ বুঝতে পেরেছে মনে হল। তাই এবার আর একটা অঙ্ক দিলাম।

তিন অঙ্কের একটা সংখ্যার এককের অঙ্কটা অজানা। সংখ্যাটাকে 6 দিয়ে ভাগ করলে ভাগফলের দশকের অঙ্কটা কী হবে?

6 5 * ÷ 6 এই ভাগের ভাগফলের দশকের স্থানের অঙ্ক কত?

প্রথমে মেয়েরা একটু অবাক। সংখ্যাটাই জানা নেই! ভাগ করব কী করে! আমি বললাম, খাতায় লেখ। বুঝতে পারবে। তখন ওরা লিখতে শুরু করল:

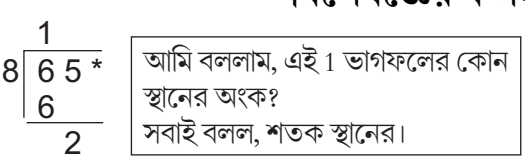

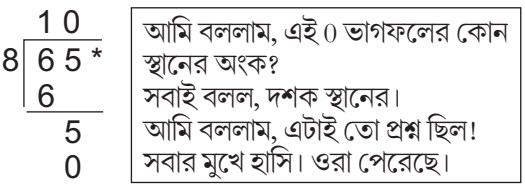

[চিত্র-6]

এবার বললাম, এই অঙ্কের ভাগফলের একক স্থানের অঙ্ক কত হতে পারে?

প্রথমে একটু চিন্তিত সবাই। আমি বললাম, ভাজ্যে একক স্থানে কী কী থাকতে পারে? আবার সবাই চিন্তিত। আমি বললাম, 0 থাকতে পারে? সবাই ঘাড় কাত করে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, সেক্ষেত্রে ভাগফলের একক স্থানে কত থাকতে পারে? একজন বলল, আট। ছয় আটে আটচল্লিশ! তাই, পঞ্চাশকে 6 দিয়ে ভাগ করলে 8!

এবার বললাম, এককের ঘরে 0 ছাড়া আর কী থাকতে পারে? 1, 2, 3, ..?

একটু ভেবেই ছাত্রীরা বলল, 9 পর্যন্ত যেকোনো সংখ্যা হতে পারে।

আমি বললাম, এককের ঘরে 9 থাকলে ভাগফল কী হবে?

কেউ একজন বলল, 9 হবে! ছয় নয়ে চুয়ান্ন! ভাজ্যের এককের ঘরে 9 থাকলে ভাগফলের এককের ঘরেও 9 হবে!

সময় শেষ। এখন ওদের গলায় আত্মবিশ্বাস স্পস্ট। ক্লাস থেকে বেরুনোর সময় আমি বললাম, তাহলে অঙ্কের ভয় গোড়া থেকে উপড়ে গেছে?

সবাই বলল, হ্যাঁ স্যার!

আমি বেরুলাম। ভাবতে লাগলাম, থ্রি এর অঙ্ক থেকে শুরু করলেও যেখানে শেষ হল সেটা মন্দ নয়! সেভেনে যারা অঙ্কে পুরো নম্বর পেয়েছে তারাও অনেকে শেষের অঙ্কটার উত্তর দেওয়া যায় এমন ভাবতে পারবে না!

ডঃ দেবব্রত মজুমদার
পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং
শিশু-কিশোরদের মধ্যে লেখাপড়া মজার করে
তুলতে স্কুল গড়ে তুলেছেন, সিলেবাস- বইপত্র লিখে চলেছেন

গণিত পাঠদান-এর গোড়ার কথা

ডঃ পার্থ কর্মকার

গণিত বিষয়টা অমন-ই, ভার্সেটাইল (versatile)। যেমন আনন্দের তেমন ভয়ের। শিখলে সহজ নইলে কঠিন।

ইস্কুলে যাওয়া নেই, সেইটে যা মঙ্গল
পথ খুঁজে ঘুরি নেকো গণিতের জঙ্গল.....'

বিষম বিপত্তি'তে কবিগুরু প্রকাশ করেছিলেন ছোটবেলায় তাঁর পাঠশালায় যাওয়ার ভীষণ এই আপত্তির কথা, গণিত জঙ্গলে ঘুরে ফেরার কথা।

আসলেই আমাদের ভাবতে হবে শিশু মনের কথা। সেখানে যেন কখনোই কোনো কিছু বোঝা না হয়। নদী যেমন আপন বেগে তার পথ খুঁজে নেয়, শিশুর অনুসন্ধিৎসু মন তেমনই স্বপ্ন দেখে, গড়ে তোলে ইমারত।আমাদের কাজ হল শিশু মনে সেই কৌতুহল, অনুসন্ধিৎসা তৈরি করা যা তাকে নিশ্চিত প্রজ্ঞার দিকে পৌঁছে দেবে।আসুন, এবার ধাপে ধাপে দেখা যাক শিশু মনে গণিতের ধারণা কীভাবে সহজ করে দেওয়া যায়।

- শৈশবের শুরুতে এক-দুই-তিন-চার সংখ্যার এই ধারণা ওদের মধ্যে আসে কীভাবে, আরও কত সহজে পরবর্তী সংখ্যা পরিচয় দেওয়া যায় তা ভাবতে হবে। মনে রাখতে হবে কোনোভাবেই শিশুর কাছে এই সময়ে জ্ঞান আহরণ বোঝা না হয়ে যায়, অযৌক্তিক না হয় বরং যুক্তির একটা ধারা যেন সেখানে থাকে।দেশলাই কাঠি, মার্বেল ইত্যাদি দিয়ে এক দশ, দুই দশ পর্যন্ত ধীরে ধীরে সেখানে যেতে পারে।

- একইভাবে যোগ এবং তার বিপরীতে বিয়োগ। ধীরে ধীরে সংখ্যা রেখার সাহায্য নেওয়া।

- এরপর যোগ বিয়োগে পারদর্শীতা আসলে, উদাহরণ দিতে দিতে শেখানো – বারবার যোগ-ই আসলে গুণ। এভাবে গুণের ধারণা এবং পরবর্তীতে ভাগের ধারণা।

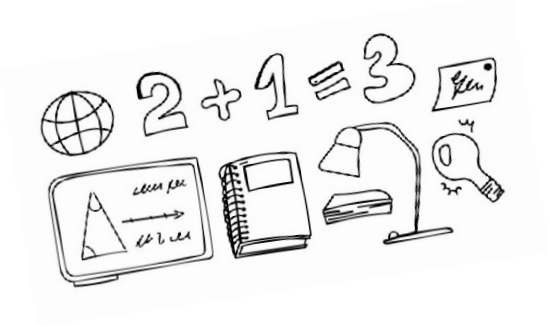

- কোনো কিছু ভেঙে গেলে তার এক একটা অংশকে বলা হয় ভগ্নাংশ। বড় একটা চকোলেট ভেঙে ভেঙে বোঝালে খুব সহজ হয়।এই কাজগুলি চার-পাঁচ বছর ধরে করার পর, ভগ্নাংশ ও দশমিক এবং তার যোগ, বিয়োগ, সরল ইত্যাদি শেখা।মুখে মুখে যোগ-বিয়োগ, গুন-ভাগ করার অনুশীলন খুব প্রয়োজন।

- লসাগু-গসাগু শেখানোর সময়ে যদি সেট থিওরির সহজ জিনিসগুলো হাতে কলমে এবং খাতায় বুঝিয়ে করানো হয়, তাহলে কখনো ছাত্র-ছাত্রীকে কষ্ট করে মুখস্ত করতে হবে না।

■ এবার আসা যাক জ্যামিতি প্রসঙ্গে :

চারপাশের ব্যবহার্য বস্তু থেকে জ্যামিতিক আকার, আকৃতি এবং তার নামকরণ শেখানো। তারপর

ওই আকার কাগজ কেটে, ছবি এঁকে তার সঠিক সংজ্ঞা, কোণের ধারণা ইত্যাদি খুব ভালো করে শেখানো প্রয়োজন। ত্রিভুজের কোণগুলো কেটে জুড়ে দিলে একটা সরল কোণে পরিণত হয়। একটি চতুর্ভুজের কর্ণ বরাবর দাগ টানলে দুটি ত্রিভুজ হয়। এমন করে পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, সপ্তভুজ থেকে যথাক্রমে তিন, চার, পাঁচ সংখ্যক ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়, এভাবে উৎপন্ন ত্রিভুজ সংখ্যার সঙ্গে ১৮০° গুণ করে যে কোনো বহুভুজের কোণের সমষ্টি নির্ণয় করা যায়।

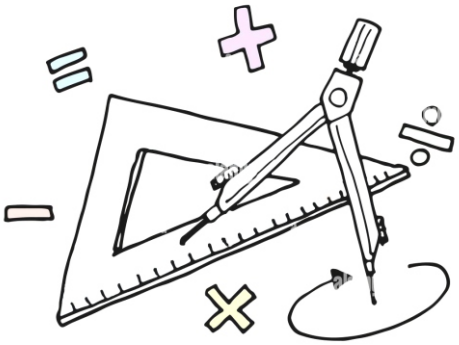

■ এবার বীজগণিত প্রসঙ্গ :

হাতে কলমে, খাতায় এঁকে শেখাতে শেখাতে এবার কল্পনায় কিছু ধরে নেওয়া হচ্ছে বীজগণিতের প্রাথমিক কথা। এটাই চলরাশি (variable)। এই চল-রাশির ধারণা ও বিভিন্নভাবে তা কিভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাহায্য করে, তা বোঝাতে পারলেই অনেক সহজ হয়ে যায় বীজগাণিতিক নিয়মে সমস্যার সমাধান। কাগজ কেটে, মডেল বানিয়ে ধাপে ধাপে বীজগণিতের সমস্ত ফর্মুলার প্রমাণ মনের মধ্যে ছবি হয়ে থেকে যায়।

সূচকের ধারণা, বীজগণিতের যোগ-বিয়োগ-গুন-ভাগ-লসাগু-গসাগু সম্পর্কে ধারণা পরিষ্কার হওয়ার পর বিভিন্ন ফর্মুলার প্রয়োগ এবং এসব থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে প্রশ্ন-উত্তর নির্মাণ করাতে পারলে শিক্ষার্থীর গণিত-ভিত মজবুত হয়।

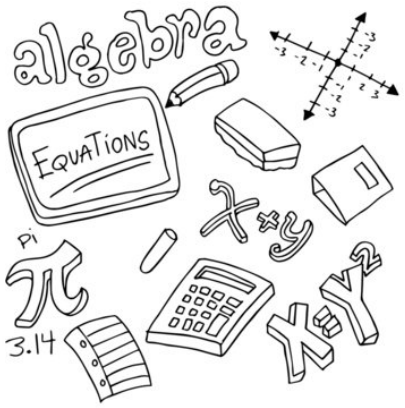

■ পাটিগণিত, পরিমিতি, ত্রিকোণমিতি, রাশিবিজ্ঞান যে কোনো ছাত্রছাত্রীর কাছে পছন্দের হবে, যদি সে আগের জিনিসগুলো ভালো করে রপ্ত করতে পারে। পরিমিতিতে একক সম্পর্কে খুবই সজাগ থাকতে হয়। ত্রিকোণমিতি বুঝে, ছবি এঁকে, কোন ফর্মুলা ব্যবহার হবে এটুকু বুঝতে পারলেই বাকি অংশ সহজে সমাধান হয়ে যায়।।

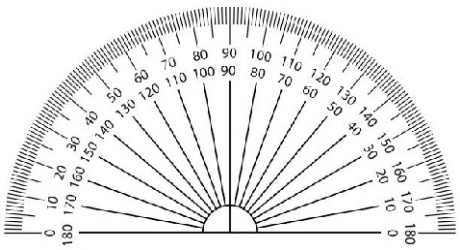

ডঃ পার্থ কর্মকার
গণিতের অধ্যাপক ও উপসচিব,
পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

The Effective Ways of Teaching and Learning English

Dr Partha Sarathi Das

English can't be properly learnt only by reading books and writing tasks .

English, being a window on the world as well as India's official language, learning English is now deemed very desirable , nay, inevitable.To give up English would mean cutting ourselves off from the present world vibrant with knowledge explosion and information explosion and expectation explosion .So, learning English is now looked upon by each and everyone as an unavoidable need .It has turned into a pervasive craze. People from all walks of life tend to place a high premium on learning English because it has a great 'surrender value' throughout the world. As a result , its demand is rocketing high. But, how to learn English well is a million - dollar-question.

Teaching as well as learning English effectively as a second language is , in fact, a very challenging task both for teachers and for students owing to a number of reasons --- One, English, to all learners, particularly in Bengali - medium institutions is absolutely alien in terms of its morphology, phonetics, semantics, syntax and graphology . Two, it's a potential source of phobia to most of our blooming learners who usually find the subject rather off-putting and so feel demotivated towards learning this language earnestly . Three, any sincere endeavour ,on the part of teachers, to make such teaching-learning interesting and joyful demands judicious application of different pedagogical , psychological and social skills to which most of our teachers remain either indifferent or averse while carrying out their classroom activities. Four, the infrastructural constraints i.e over - populated class room, dearth of teachers, less exposure to the proper ELT environment negatively impact the learning of English.

To overcome such a challenge and to transform the dry, drab style of teaching and learning (English) into a vibrant one, continuous researches and efforts are on and on.Methods and models galore are there in the domain of English Language Teaching (ELT). But, to my way of thinking, they may be encapsulated in a nutshell into the ' POMC' concept as propounded in

the study of 'Management' as the act of teaching - learning itself is closely associated with the classroom management.

POMC ----------

1) Planning (P)= Before carrying out the classroom activities, the important tasks are- a) need analysis on basis of learner's age, ability, attitude, ambience b) formulation of the learning objectives c) preparation of the proper lesson plan d) selection of the topic e) selection of the 3M's= Method ,Mode , Materials : Method (direct method, structural situational method, communicative method, audio lingual method, - grammar translation method etc); Mode (listening, speaking, reading , writing); Materials (TLMs). These activities form the very foundation without which the mansion of ELT programme will collapse miserably.

2) Organising (O)=a) executing the plan according to the lesson plan b) proper use of the method, mode and materials.

3)Motivating (M)= No motivation, no learning. Psychologically , the mother of Learning is Attention; the mother of Attention is Interest; the mother of Interest is Motivation. So, Motivation is the great grand mother of Learning. To motivate the English learning students , a teacher should skilfully utilise different strategies and techniques e.g- a) pair and group work , b) chorus, c) rhyme, d) role play, e) quiz , f) news paper reading , g) language magic, h) chart, i) diagram, j) song, k) recitation, l) debate, m) elocution, n) drama , o) extempore, p)magazine, q) language drills, r)language game, s) project, t)positive reinforcement in the form of reward, u) computer assisted learning (CAL) v) proper stimulus variation including posturing and gesturing w) TLMs and the authentic materials x) language drills y) model z) story telling and what not.

4) Controlling (C) = The teacher must have control over the the whole process of ELT in the classroom situation to maintain the clarity, continuity , and consistency to achieve the pre- determined instructional objectives. For this, a) completion of syllabus as per the routine, b) proper evaluation, c) feedback and d) guidance and counselling and e)the follow up measures are necessary, nay, mandatory.To sum up, swimming can't be learnt only by reading the books and writing the tasks on swimming . One must go down to the pool and learn how to swim only by swimming .Similarly, learning English can't be properly learnt only by reading books and writing tasks .Learning or speaking English can be learnt better by speaking in reference to different contexts or situations. In short, to reap the best harvest, the process of ELT should blend together understanding, listening, speaking, reading and writing harmoniously.

Dr Partha Sarathi Das

Renowned author and Retired Headmaster,
Hatgacha Haridas Vidyapith

বিজ্ঞান (রসায়ন) – ভালো লাগবে কীভাবে

আনিসুর আলী জমাদার

মাথার ওপর পাখা ঘোরা থেকে চলন্ত বাসে ব্রেক কসলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া –সবটাই তো হয় বিজ্ঞানের যুক্তি মেনে। এসব দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে পড়াতে পারলে তা শিক্ষার্থীর কাছে উৎসাহব্যঞ্জক হবেই।

একদিন বিদ্যালয়ে ঢুকতেই দেখি একজন ছাত্র আমার পায়ে প্রণাম করে বলতে লাগলো "স্যার আমি বিজ্ঞান প্রয়োগ করতে শিখে গেছি।" জানতে চাইলে খুব উৎফুল্লের সঙ্গে সে বলতে লাগল, গতকাল তার ঠাকুরমা বটি দিয়ে মাছ কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলেছিল,রক্ত বের হচ্ছিল, সে নাকি তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে কিছু না পেয়ে ফিটকিরি ঠাকুরমার হাতে চেপে ধরেছিল। তাতে তার ঠাকুর মার হাত থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়েছিল। আসলে তার আগের দিনই আমি রসায়নের চ্যাপ্টারের কলয়েড পড়াতে গিয়ে একটু সিলেবাসের বাইরে গিয়েই কলোয়েডের তঞ্চন প্রক্রিয়া, সুলোজ হার্ডির সূত্র বোঝাতে গিয়ে বলেছিলাম বাড়িতে বাবা দাড়ি সেভিং করার পর ফিটকারি ব্যবহার করে কেন, ফিটকারি কিভাবে রক্তকে তঞ্চন করতে সাহায্য করে? ইত্যাদি ইত্যাদি। আর সেই শেখানোটা আজ সে নিজের বাড়িতে প্রয়োগ করতে পেরে তার যে কি খুশি, কি উদ্দীপনা টের পেয়েছিলাম।

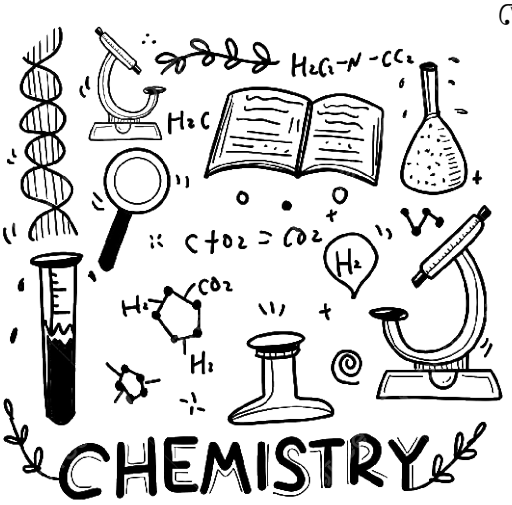

আসলে পড়ানো এবং শেখানো শব্দটি এক নয়। শব্দ দুটি একই রকম মনে হলেও এদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।। আর আমার মনে হয় একজন শিক্ষকের প্রধান কাজ হওয়া উচিত শেখানো। একজন শিক্ষক যদি কোন বিষয়ে শেখাতে পারে তবে তিনি প্রকৃত শিক্ষকে পরিণত হবেন। কারণ শেখানোর মধ্যে দিয়েই একজন শিক্ষার্থীর মধ্যে বিষয়ের প্রতি ভালোবাসা সঞ্চার করানো যায় এবং সেই সঙ্গে বিষয়টার প্রতি আগ্রহ জন্মানো যায়। আর বিষয়টি যদি রসায়ন বা ভৌতবিজ্ঞান হয় তবে তো আর কথাই নেই। একজন রসায়ন শিক্ষক হিসাবে আমার বারবার যে কথা মনে হয় তাহল, সাধারণ শিক্ষার্থী-দের কাছে বিষয়টি ভালোবাসার হবে না ভয়ের হবে তা অনেকটাই আমাদের পড়ানোর ধরন-ধারণের উপর নির্ভর করে। প্রায়শই একটা কথা শোনা যায়, রসায়ন-গণিত এসব খুব কঠিন বিষয়। আসলে এই ভয়ের কারণ হল বিষয়টি শিখতে না পারা বা বিষয়টির প্রতি ভালোলাগা না জন্মাতে পারা। ফলে আগ্রহ কমতে থাকে এবং ধীরে ধীরে বিষয়টির প্রতি ভয় জন্মাতে শুরু করে। তাই শিক্ষক হিসেবে আমাদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল সহজ,সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় রসায়ন নামক বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা।

যে কোনো বিষয়বস্তু শুরুর আগেই আমাদের

আশেপাশের কিছু প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়ে তারপর সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের পঠন-পাঠন শুরু করা উচিত। যেমন ধরুন আজ আপনি রসায়নের অ্যাসিড ক্ষার লবণ বিষয়টি পড়াতে চাইছেন,আপনি যেটা করতে পারেন,আপনি ছাত্র-ছাত্রীদের বলতে পারেন আগামীকাল তোদের একটা ম্যাজিক দেখাবো তোরা বাড়ি থেকে লেবু, তেতুল জবা ফুল নিয়ে আসবি। তখন দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সে কি উৎসাহ।এবার পরের দিন যদি আমরা তাতে একটা লিটমাস পেপার নিয় এসিড ক্ষারের বিভিন্ন বর্ণ পরিবর্তনের পরীক্ষা দেখাতে পারি,তাহলে শিক্ষার্থীদের

মধ্যে চাক্ষুষ এসিড ক্ষারের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা গুলি তাদের এই চ্যাপ্টারের বিষয়বস্তু গুলি শিখতে সাহায্য করবে। এইভাবে শিক্ষক হিসাবে আমাদের প্রতিনিয়ত শিক্ষার্থীদের ভাবাতে হবে বিজ্ঞান বা রসায়ন আর কিছুই নয় এটি মহান সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত সৃষ্ট জল,বায়ু মাটি ও আগুন। আর বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানীদের প্রধান কাজ এদের মধ্যে অন্তর্নিহিত রহস্য উদঘাটন করা বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়গুলি ভালো লাগাতে গেলে বিভিন্ন সময় শুধুমাত্র সিলেবাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকেও অনেক সময় সিলেবাসের বাইরে গিয়ে বিভিন্ন তথ্য বিষয় উদ্ঘাটন করা উচিত। ছাত্র-ছাত্রীদের চিন্তা করানো শেখানো শেখাতে হবে,ভাবতে শেখাতে হবে,প্রশ্ন করতে শেখাতে হবে, যুক্তি দিয়ে বিষয়বস্তু বুঝতে শেখাতে হবে। শেখাতে হবে

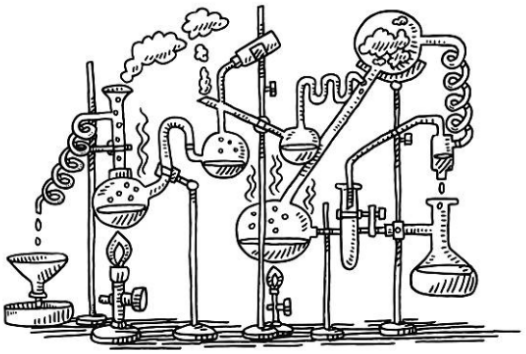

শেখার পর কীভাবে তা প্রয়োগ করতে হবে,শেখাতে হবে শেখার পর প্রয়োগ করার পর তা কী করে অধ্যায়ন করতে হবে এবং সেই সঙ্গে এটাও শেখাতে হবে এই শেখানো বিষয়বস্তুগুলি কোন টেকনিকে পড়তে হবে এবং অবশ্যই তা মনে রাখতে হবে কীভাবে।

এইভাবে আমরা শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের মধ্যে শেখানোর অভ্যাস তৈরি করতে পারি তখন আমরা দেখতে পাবো কীভাবে এই বিজ্ঞান তথা রসায়ন তাদের ভালো লেগে যাবে। আর শুধু বিজ্ঞান কেন, সব বিষয়ে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারলেই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ভালো লাগতে শুরু করবে।

আনিসুর আলী জমাদার
রসায়ন শিক্ষক, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়, নরেন্দ্রপুর

প্রশ্ন যখন প্রশ্ন নিয়ে

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

একটি প্রশ্ন যখন আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে, শিক্ষার্থীকে নতুন আঙ্গিকে ভাবতে শেখায়, নিঃসন্দেহে প্রশ্নটিকে ভালো বলা চলে। আজকের শিক্ষায় এমসিকিউ প্রশ্ন কতখানি তা শেখায়, প্রশ্ন রেখেছেন..

কিছুদিন আগে এক বিতর্ক সভায় হাজিরা দেবার আমন্ত্রণ এসেছিল। বাড়ি বয়ে এসে আমন্ত্রণ জানাতে আসা উদ্যোক্তাদের বলেছিলাম নিশ্চয়ই একবার শুনতে যাব। বাড়ির কাছে হওয়ায় সময় মতো টুকটুক করে হাজির হতেই উদ্যোক্তাদের তরফে একরকম চ্যাংদোলা করে বসিয়ে দিল বিচারকের আসনে। আসরে উপস্থিত যুযুধান দুপক্ষই দেখি একেবারে আস্তিন গুটিয়ে তৈরি। বিতর্কের বিষয়টি ছিল এইরকম – সভার মতে : "প্রশ্নপত্রে MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ভিড়ে শিক্ষা তার অভিমুখ হারিয়েছে।" বিষয়টি যে সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই সময়ের পাঠ মূল্যায়নের প্রেক্ষাপটে তা বোধহয় নতুন করে বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখেনা।

আজকাল পাঠ মূল্যায়নের সবস্তরেই MCQ জাতীয় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের রমরমা। মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় চার দশক আগে, রাজ্যের বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সরকারের শিক্ষা দপ্তরের পরিকল্পনা অনুসারে প্রশ্নপত্রে চার ধরনের প্রশ্ন সংযোজনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছিল। প্রস্তাবিত এই চার ধরনের প্রশ্নগুলো হলো - জ্ঞানমূলক, বোধমূলক, প্রয়োগমূলক এবং দক্ষতামূলক। রীতিমতো কর্মশালার আয়োজন করে নতুন ধাঁচের প্রশ্নপত্র রচনার সমস্ত কৃৎ কৌশল মাস্টারমশাই - দিদিমণিদের একেবারে মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হলো। বেশ কিছুদিন সোৎসাহে ব্যাপারটা এভাবেই চলল । জ্ঞান বোধ প্রয়োগ আর দক্ষতার দড়ি টানাটানির জেরে শিক্ষার্থী - শিক্ষক - অভিভাবকদের তখন একেবারে সসেমিরা অবস্থা।

আমরা তখন তরুণ প্রজন্মের তুর্কি শিক্ষক, অনেক স্বপ্ন নিয়ে যা নতুন তাকে আঁকড়ে ধরছি। পরীক্ষা নিরীক্ষায় মশগুল। অন্যদিকে যাঁরা বেশ কয়েক বছর ধরে এই গতানুগতিক পাঠ দানের পেশায় ঘানি টেনে নিজেদের প্রেশার বাড়িয়ে ফেলেছেন , সেই সব বরিষ্ঠ,অভিজ্ঞ শিক্ষকেরা প্রশ্নের চক্করে নাজেহাল হয়ে ছড়া বাঁধলেন – "খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে / কাল হলো এঁড়ে গরু কিনে ..।" প্রশ্নের এমন কায়দা অবশ্য খুব বেশি দিন স্থায়ী হলো না। নানা মহলের আপত্তির কারণে একসময় ধীরে ধীরে গোটা ভাবনাটাই স্মৃতির অতলে তলিয়ে গেল। তবে নতুন ব্যবস্থায় ছেলেপুলেরা বেশ খুশি হয়েছিল ,কারণ – আগের তুলনায় তারা অনেক অনেক বেশি নম্বর পাচ্ছিল, অভিভাবকরাও খুশি হলেন , কেননা তাঁদের সন্তানেরা এখন অনেক নম্বরে ভরা প্রগতিপত্র হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরছে, মাননীয় শিক্ষকদের মধ্যেও অনেকেই বেশ আহ্লাদিত হলেন এই ভেবে যে খাতা দেখতে এখন আর খুব সময় লাগছে না, তবে প্রশ্নপত্রে জ্ঞান বোধ দক্ষতার শ্রেণিচরিত্র নিয়ে মাঝেমধ্যে খটকা থেকে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা কলেজ স্ট্রিট পাড়ার পাঠ্যপুস্তক ব্যবসায় নতুন জোয়ার এনে দিল। নানা রকম প্রশ্নের পসরা নিয়ে তাঁরা নিয়ে এলেন রকমারি কম্প্যানিয়ন। ছেলেমেয়েরা মায় মাস্টারমশাই দিদিমণিরাও এই সব পাঠ সাথীদের নিয়ে হামলে পড়লেন। স্বস্তির শ্বাস ছেড়ে সকলেই বললেন – যাক্! এতদিনে প্রশ্নপত্র তৈরির হ্যাপা থেকে বাঁচলাম !

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়
বিশিষ্ট লেখক ও সমাজকর্মী এবং অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক

অনুসন্ধান সোসাইটি

এগিয়ে চলা শিক্ষা-সংস্কৃতির গোড়ার খোঁজে

পরিচিতি : অনুসন্ধান কলকাতা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক কাজকর্ম-কেন্দ্রিক একটি অরাজনৈতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান।

যাঁরা যুক্ত আছেন :

মূলত অবসরপ্রাপ্ত ও কর্মরত বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক বিজ্ঞানীবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন। যুক্ত আছেন স্বনামধন্য শিক্ষা-গবেষক শিল্পী সাহিত্যিক মনোবিদ প্রযুক্তিবিদ। অনুসন্ধানের সন্ধানী ও পৃষ্ঠপোষক তালিকা দীর্ঘ এবং তা রাজ্য ও দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে বিস্তৃত।

সূচনা :

ভাবনার শুরু ২০১৮ সালের মে মাস নাগাদ। বিশিষ্ট শিক্ষা-প্রশাসক মাননীয় দিব্যগোপাল ঘটক, শিক্ষক ড. দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, সজল রায়চৌধুরী, শেখ আলী আহসান, পঙ্কজ মহাপাত্র, নায়ীমুল হক, শাহাবুল ইসলাম গাজী, আসাদুজ্জামান, পান্থ মল্লিক প্রমুখ গুণীজনের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং আরো অনেকের সম্মিলিত উদ্যোগে মাধ্যমিক, উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অতিরিক্ত কিছু প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়। পাশে দাঁড়ানোর জন্য সম-মনোভাবাপন্ন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে আবেদন জানানো হলে তাঁরা যথাসম্ভব সাহায্য করতে সম্মত হন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার যেসব বিদ্যালয়ের সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি ছিল সেই সব বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা তাঁদের বিদ্যালয়ে সাদর আহ্বান জানান। অতঃপর মুর্শিদাবাদ, মালদা, হুগলি, হাওড়া, বর্ধমান, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেশ কিছু বিদ্যালয়ে সফর সম্পন্ন হয়। শুরু হয় কাজ।

নামকরণ ও লোগো :

২০২১ সালের প্রথম দিকে প্রাতঃস্মরণীয় বিজ্ঞানী সমর বাগচী মহাশয় সংগঠনের নাম রাখলেন 'অনুসন্ধান'। এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী মিহির সেনগুপ্ত মহাশয়। লোগো প্রস্তুত হল আরো কিছু পরে– ২৬ জুলাই তারিখে, আর একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান সাহেবের তদারকিতে।

অনুসন্ধান নামকরণ করলেন সমর বাগচী :
হাতে-কলমে বিজ্ঞানের প্রাণপুরুষ

কর্মসূচি : এক নজরে

■ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার মান উন্নয়নে এবং নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে নানা-আঙ্গিকে অনুষ্ঠান ও বিবিধ কর্মসূচি :

- মাধ্যমিক প্রস্তুতিতে পরীক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়াতে বছরভর কর্মসূচি :–
- প্রতিমাসে অনলাইনে সাতটি বিষয়ের MCQ পরীক্ষা
- প্রতিমাসে অনলাইনে ডাউট ক্লিয়ারিং ক্লাস
- পরীক্ষার ঠিক পূর্বে বিশিষ্ট মনোবিদদের সহায়তায় মোটিভেশন ক্লাস, স্ট্রেস-ম্যানেজমেন্ট এবং বিশেষ ক্লাস
- এছাড়াও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অফলাইনে মাধ্যমিক প্রস্তুতির বিশেষ পরীক্ষা ও সেমিনার [বিষয়: কীভাবে হবে আদর্শ প্রস্তুতি, পরীক্ষা হলে টাইম ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি

• এছাড়াও থাকে প্রকাশনা – মাধ্যমিক টেস্ট পেপার্স, সাজেশনস

• পরীক্ষার পরে থাকে কাউন্সেলিং, এডুকেশন কেরিয়ার গাইডেন্স-এর অনলাইন ও অফলাইনে অনুষ্ঠান

• ক্লাস থ্রি থেকে টেন পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসের সকল বোর্ডের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন। এর প্রধান উদ্দেশ্য মেধার সন্ধান ও যথাযথ বিকাশ এবং সুস্থ প্রতিযোগিতার মানসিকতা গড়ে তোলা

• বানান প্রতিযোগিতা, আঁকা প্রতিযোগিতা, লেখা প্রতিযোগিতা, সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা, কুইজ কম্পিটিশন

• লেখালেখিতে উৎসাহ দিতে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পত্র নিয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

• বইপত্র পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে তুলতে আবাসিক বিদ্যালয়ে উন্নত মানের পত্র-পত্রিকার সম্ভার গড়তে সাহায্য করা

• ছোট ক্লাস থেকেই বিজ্ঞানে মজা পেতে বিদ্যালয়ে ল্যাবরেটরি গঠনে সহায়তা

• গ্রাম ও শহরের ছাত্র-ছাত্রীদের পারস্পরিক মেলবন্ধন গড়ে তুলতে এক্সচেঞ্জ-প্রোগ্রাম

তখন কোভিড মধ্য গগনে। বিশিষ্ট শিক্ষা প্রশাসক
দিব্য গোপাল ঘটকের বাড়িতে পৌঁছে
অনুসন্ধান শিক্ষা সম্মাননা হাতে তুলে দিচ্ছে নাছোড়বান্দা প্রত্যুষ

■ শিক্ষকদের জন্য ভিন্নমুখী কর্মশালা :

• ছাত্র-ছাত্রীদের মেন্টরিং কীভাবে

• আদর্শ ক্লাস পরিচালনা কীভাবে

• হাতে-কলমে এক্সপেরিমেন্ট এর মাধ্যমে সমস্ত বিষয়ের উপস্থাপনা

• পাঠদান-এর মাঝে ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা নির্ণয় এবং তার উন্নয়ন

• অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা ও গুণীজনদের লেখা ও প্রবন্ধ নিয়ে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

ডঃ সুপ্রিয় কুমার সাধু গ্রহণ করছেন
অনুসন্ধান শিক্ষা সম্মান ২০২৩ ছোট্ট মাহরিন-এর হাত থেকে

■ গুণীজন সম্মিলন ও সম্মাননা জ্ঞাপন-

• শিক্ষক দিবস, বিজ্ঞান দিবস, পরিবেশ দিবস, গণিত দিবস ইত্যাদি দিবস উদযাপনে গুণীজন সম্মিলনী ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা

• গুণী শিক্ষকদের শিক্ষা সম্মাননা ও সমর বাগচী স্মৃতি শিক্ষা সম্মান প্রদানের আয়োজন

• বিজ্ঞানের যে সমস্ত পরিভাষা আগামী দিনে বিদ্যালয়-পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হতে যাচ্ছে, সেগুলি নিয়ে সরাসরি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কথোপকথন

• বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উৎসাহী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক-বিজ্ঞানী সহ তরুণ গবেষকদের সঙ্গে সরাসরি অনলাইনে আলাপচারিতার ব্যবস্থাপনা

• মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, নিট, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষায় শীর্ষ স্থানাধিকারীদের সঙ্গে আলাপচারিতা ও তাদের সাক্ষাৎকার সম্প্রচার।

সাংস্কৃতিক অঙ্গন

বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান

• জানুয়ারি - বই দিবস উদযাপন, জাতীয় যুব দিবস উদযাপন।

• ফেব্রুয়ারি - আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন,জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন।

• মার্চ -আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন, বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আইনস্টাইন-এর জন্ম দিবস পালন।

• মে - আন্তর্জাতিক মাতৃদিবস উদযাপন।

• জুন- বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন ও বিভিন্ন ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নানা ধরনের প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার পর্ব। এছাড়াও থাকে বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ উপহার ইত্যাদি।

• জুলাই - চিকিৎসক দিবস পালন, প্রথম বাঙালি মহিলা চিকিৎসক কাদম্বিনী গাঙ্গুলীর জন্মদিবস পালন।

• আগস্ট - ভারত ছাড়ো আন্দোলন দিবস উদযাপন, হিরোশিমা ও নাগাসাকি দিবস উদযাপন।

• সেপ্টেম্বর -শিক্ষক দিবস উদযাপন ও শিক্ষক দিবস সংখ্যা প্রকাশ।

• ডিসেম্বর -জাতীয় গণিত দিবস উদযাপন এবং গণিত দিবস উপলক্ষে প্রতিযোগিতা ও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ।

ANUSANDHAN SOCIETY
Reg. No.S0052789 of 2024-25
12/18, Simultala Lane,Uttarpara-Kotrung,
Hooghly -712232, West Bengal, India
Contact Nos. 98360 58826/968 168 7670
E-mail id: anusandhan.kolkata@gmail.com
Website: https://anusandhan.org.in/

শিক্ষক

রাহুল সেনগুপ্ত

পড়ে শোন, শুনে পড়। মাঝে মাঝে থাম,
ভাবনায় শান দিয়ে মাঠে ঘাটে নাম।
আমরাও সাথে আছি, রোদ্দুরে জলে,
বই যাতে মাঝে মাঝে দুটো কথা বলে।
সেইতো ধরিয়ে দেবে পৃথিবীর ভাষা,
তাকে কথা বলাতেই, আমাদের আসা।

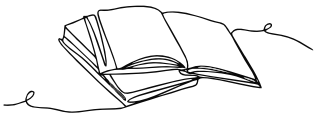

ভালো বেসে, ভালো রেখে, ভালো থাকে যারা,
বুকের বিশ্বাস নিয়ে, সোজা শিরদাঁড়া,
উদয়ন পন্ডিতেরা, আলো খুঁজে চলে,
বলে দেয় পৃথিবীকে ভালো কাকে বলে,
সময়কে সাথে নিয়ে, সময়ের পারে,
ঘন চোখ মেলে রাখে গাঢ় অন্ধকারে,
উদয়ন পন্ডিতেরা, দিয়ে যাক আলো,
ভালো বেসে, ভালো রেখে, ওরা থাক ভালো।

পাঁচু বসে ল্যাজ গুটিয়ে, করছে বিষম পড়া,
সারাটা ক্লাস নিঝুম যেন, চক্ষু ছানাবড়া !
ব্যাপারটা কি? শরীর খারাপ? আজকে হঠাৎ বই?
সবাই মিলে ভাবছে বসে, পাচ্ছে নাকো থৈ।
পড়ার শেষে, তুলল পাঁচু, গভীর কালো চোখ।
দোয়া করি, তোদের সবার মনটা ভালো হোক।
ক্লাস ফাইভে সরল আছে, ক্লাস সেভেনে তাপ,
সবই জানি, একটু তবু ঝালিয়ে নিলাম বাপ্!
আজকে আমি স্যার হয়েছি, তাই গোটানো লেজ,
কালকে আবার অন্য পাঁচু! অন্যরকম তেজ!

রাহুল সেনগুপ্ত
অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, আচার্য প্রফুলচন্দ্র হাই স্কুল ফর বয়েজ, সল্ট লেক

সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে আপনি কি ভাবছেন?

অভিজ্ঞ শিক্ষকরা বলেন

- **ভিত মজবুত করো , পড়াশোনায় আনন্দ পাবে**
  We offer : FOUNDATION COURSE for CLASS VIII, IX, X
- **কাজ ফেলে রেখো না**
  আমাদের প্রোগ্রাম : **মাসের পড়া মাসেই রেডি**
  (প্রতি মাসে বোর্ড ও সর্বভারতীয় মানে নিবিড় অনুশীলন)
- **লক্ষ্যে থাকো অবিচল**
  আমাদের মুখ্য বৈশিষ্ট্য : মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের সেরা প্রস্তুতি
  অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা মক টেস্ট - ১ ও ২
  ডাউট ক্লিয়ারিং এবং মোটিভেশন ক্লাস

dLearn Academy
Educate ⟷ Etiquette ⟷ Education

Website: https://dhilearnacademy.com
Mobile: 8900042758 / 9339395846
http://youtu.be/zyh32HIy-KE

PATAKA

A COMPLETE CARE MULTI-SPECIALITY HOSPITAL THAT BRINGS YOU THE BEST HEALTHCARE SERVICES

BENEFIT FROM THE FULL SPECTRUM OF MEDICAL SERVICES

BLOODLESS PAINLESS LASER COLORECTAL SURGERY
BRING BACK THE SMILE : FREE CLEFT LIP/PALATE SURGERY

SPECIAL OFFERS

ECONOMY SURGERY : GYNAE & ORTHO PACKAGES
GASTROENTEROLOGICAL SOLUTIONS INCLUDING LAPAROSCOPIC HERNIA SURGERY

ONE STOP ANSWER FOR ALL YOUR DENTAL & EYE PROBLEMS

END TO END SOLUTION FOR DIABETIC NEEDS INCLUDING DIABETIC FOOT CARE

GD HOSPITAL & DIABETES INSTITUTE
CARE FOR LIFE

AN ISO 9001: 2015 CERTIFIED HOSPITAL

139A, LENIN SARANI, KOLKATA - 700 013 033 6687 6687

এই 'চা'এ আছে মনমাতানো স্বাদ